মনের হাকীকত

হাফেয সালেহ্ আহ্মাদ

মনের হাকীকত

হাফেয সালেহ্ আহ্মাদ

এম.এম. ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা

আরবি ভাষা কোর্স, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু

সঊদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব।

প্রাক্তন ইমাম ও খতীব : ইস্ট লন্ডন মসজিদ,

যুক্তরাজ্য ও কাটাবন কেন্দ্রীয় মসজিদ, ঢাকা।

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

মনের হাকীকত
হাফেয সালেহ্ আহ্মাদ
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
ISBN : 978-984-8808-07-8

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০

প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০০৯
জিলহজ্জ, ১৪৩০
অগ্রহায়ণ, ১৪১৬

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৯৬৬৩৭৮২

মূল্য : পঞ্চান্ন টাকা মাত্র

Moner Hakikat (The interpretation of Mind) written by **Hofez Salah Ahmad** Published by **Ahsan Publication** 38/3 Banglabazar, Dhaka First Edition November, 2009 Pirce Tk. 55.00 only.

AP-63

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদের চলার পথকে সহজ ও সুগম করে দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি, যিনি আল্লাহর দেয়া হেদায়াতকে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপন করেছেন।

মন আল্লাহর সৃষ্ট একটি মহান নিয়ামত। সামান্য বুঝ-জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাটি জীবনেই এ মনের ভূমিকা পরিব্যাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত। সুখ-দুখ, হাসি-কান্না, উন্নতি-অবনতি, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ তথা আখেরাতে জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি সব কিছুই এ মনের ভিত্তিতেই রচিত ও সাব্যস্ত হয়। অতএব এর গুরুত্ব অপরিসীম। আর এরই কারণে মন সম্পর্কে গবেষণা ও অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। মনের হাকীকত ও রহস্য সম্পর্কে সকল ভাষায়ই বিরাট বিরাট গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে মনকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার দেয়া হেদায়াতের আলোকে মনের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। অনেকেই মনের ভূমিকা কার্যকারিতা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণায় লিপ্ত। এ বইতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তার বিশদ ব্যাখ্যা ও জবাব পেশ করা হয়েছে। এ বিষয়ের ভুল ধারণা দুনিয়া ও আখেরাতকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এ বই পড়ে যদি আল্লাহর কোনো বান্দা সামান্যতমও উপকৃত হয় তাহলেই আমার এ শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ তা'আলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন এবং আখেরাতের কঠিন মুহূর্তে একে আমার নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন!

হাফেয সালেহ্ আহ্মাদ
৩০ মে, শুক্রবার, ২০০৮ইং
আবুধাবী

সূচী পত্র

মনের বিশ্লেষণ

মন মানুষের দেহের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আসলে প্রতিটি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রতিটি অঙ্গের তুলনায় মনের এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে যা অবশিষ্ট অঙ্গসমূহের মধ্যে নেই। যেমন, দেহের প্রতিটি অঙ্গই হলো নিছক এক একটি জড় ও জৈব টুকরা বা অংশ যা মানুষের জীবনকে সচল রাখার জন্য নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু মন শুধুমাত্র একটি জড় মাংসপিণ্ডই নয়, বরং তার রয়েছে অনুভব ও কল্পনা করার শক্তি। তার রয়েছে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, আর তা বাস্তবায়নের জন্য দেহের অন্যান্য সকল অঙ্গ মনের অনুগত দাস ও কর্মচারী হিসেবে অকপটে কাজ করে। অতএব দেহের মাঝে মনের অবস্থান ও ভূমিকা হলো নেতা ও আদেশকর্তার ন্যায়। তাই শুরুতে আমি একে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করেছি।

কারোর মন যদি আনন্দিত ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকে তাহলে তার পূর্ণ দেহসত্তা তথা জীবন হয় সুখ, শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দপূর্ণ। আর মন যদি হয় অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাহলে তার পূর্ণ সত্তা ও জীবন হয় অস্থির, অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, আর তা হয়ে ওঠে দুঃখ, কষ্ট ও বেদনায় জর্জরিত। কারোর মন যদি হয় সভ্য, চরিত্রবান, দায়িত্ববান ও নিষ্ঠাবান তাহলে তার পূর্ণ সত্তা, জীবন ও আশপাশের পরিবেশকে করে তোলে সে সুন্দর, আদর্শবান, শান্তিময়, কল্যাণময় ও উন্নত। আর মন যদি হয় কুটিল, সংকীর্ণ, দুষ্ট, দুশ্চরিত্রবান ও অসভ্য তাহলে সে নিজের জীবন ও আশপাশের পরিবেশকে করে তোলে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ, অস্থিতিশীল, ধ্বংস ও বিপর্যস্ত। তাহলে মনের হাকীকত ও রহস্য কি? কি এর প্রকৃতি? এর নিয়ন্ত্রণ ও পরিশুদ্ধির উপায় কি? এর ব্যাধি ও তার নিরাময়ের ব্যবস্থা কি? আসুন, আমরা ইত্যাকার বিষয়সমূহ জানার চেষ্টা করি।

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মনের দু'টি দিক আছে। তা হলো, বস্তুগত দিক ও আধ্যাত্মিক দিক। মনের বস্তুগত (Physiological) বিশ্লেষণ আমার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। বরং এর ভাবগত ও আধ্যাত্মিক (Spiritual) দিকের বিশ্লেষণ আমার আলোচনার বিষয়বস্তু।

মনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো :

১. Heart – এটি বস্তুগত ও ভাবগত দু'টি দিককেই শামিল করে।

২. Mind – মন, স্মৃতি, স্মরণ।

এছাড়া মনের প্রকৃতি, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কিছু প্রতিশব্দ হলো :

৩. Intelligence – বুদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা, মেধা, বোধশক্তি

৪. Understand – বুঝা, উপলব্ধি করা

৫. Perceive – অবহিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা, হৃদয়ঙ্গম করা, উপলব্ধি করা

৬. Sensation – অনুভব করার শক্তি, সংবেদন, ইন্দ্রিয়বোধ, অনুভূতি

(এ গুণটি মন ছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যেও বিদ্যমান)

৭. Consciousncs – চেতনা, সজ্ঞানতা

৮. Will – ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, ইচ্ছাশক্তি

৯. Spirit – নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনা ও অনুভূতি, সাহসিকতা, তেজস্বিতা, সজীবতা, উচ্ছ্বাস, চাঞ্চল্যতা

১০. Thought – চিন্তা, চিন্তাশক্তি

১১. Imagination – কল্পনা, কল্পনাশক্তি

১২. Invent – সৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা

১৩. Opinion – ধারণা, মত

১৪. Consideration – চিন্তা, বিবেচনা, গুরুত্ব

১৫. Intention – অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য, সংকল্প, ইচ্ছা

১৬. Desire – কামনা, ইচ্ছা, বাসনা, স্পৃহা, অভিলাষ

১৭. Mood – মানসিক অবস্থা, মেজাজ, মনের গতি

১৮. Affection – স্নেহ, প্রেম, মমত্ব, ভালোবাসা

১৯. Interest – আগ্রহ, আকর্ষণ, আসক্তি, অনুরাগ, স্পৃহা, আমোদ, কৌতূহল

২০. Memory – স্মৃতি, স্মরণ

২১. Attention – মনোযোগ, অভিনিবেশ

২২. Sincerity – আন্তরিকতা, সততা

২৩. Devotion – গভীর অনুরক্তি, ধার্মিকতা, আরাধনা, আত্মউৎসর্গ, নিবেদিতপ্রাণ

২৪. Choose – বাছাই, পছন্দ

২৫. Decision – সিদ্ধান্ত, মীমাংসা, নিষ্পত্তি;

উপরোক্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রায় সবই মনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

মনের আরবি প্রতিশব্দ হলো কাল্‌ব্ (قَلْبٌ)। এর শাব্দিক অর্থ, কোনো কিছুকে বিপরীত দিকে উল্টিয়ে দেয়া, ফিরিয়ে দেয়া, পরিবর্তিত করে দেয়া ও অন্যমুখী করে দেয়া। কোনো কোনো আরবি আভিধানিক বলেছেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল হবার কারণে মনকে 'কাল্‌ব্' বলা হয়। বাস্তবিকই লক্ষ্য করা যায় যে, জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মনে প্রতিনিয়ত একের পর এক (শত শত) বিষয়ের ভাব ও কল্পনা উদয় হতেই থাকে। জাগ্রত অবস্থায় কোনো কিছু কল্পনা করা ছাড়া মানুষের একটি মুহূর্তও অতিবাহিত হয় না।

আরবিতে কখনও 'বিবেক-বুদ্ধি' অর্থে 'কাল্‌ব্'-এর ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমল, হাশরের ময়দানের চিত্র, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করার পর ইরশাদ করেন :

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ... (ق : ٣٧)

"নিশ্চয়ই এতে উপদেশ রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যার বিবেক-বুদ্ধি আছে"। (সূরা কাফ : ৩৭)

এমনিভাবে বলা হয় :

"مَالَكَ قَلْبٌ" তোমার অন্তর নাই।

"وَمَا قَلْبُكَ مَعَكَ" তোমার সাথে তোমার অন্তর নাই।

"أَيْنَ ذَهَبَ قَلْبُكَ" কোথায় গেলো তোমার অন্তর?

এ বাক্যসমূহে 'বিবেক, অনুভূতি ও মনযোগ' অর্থে 'কাল্‌ব্'-এর ব্যবহার হয়েছে।

মনের নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতকে পরিচালনা করার জন্য দুই প্রকারের বিধান জারি করেছেন। যথা :

১। প্রাকৃতিক বিধান (نِظَامٌ كَوْنِيٌّ)

২। শারী'য়ার বিধান (نِظَامٌ شَرْعِيٌّ)

মানুষ ও জিন ছাড়া বাকি সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধান পরিপূর্ণভাবে কার্যকর ও চলমান আছে। এ বিধান স্বভাবগত, যার সামান্যতম ব্যতিক্রম ঘটানো ও তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা তাদের নেই। যেমন ফেরেশতাগণ স্বভাবগতভাবে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও কোটি কোটি নক্ষত্রের জন্য যে দায়িত্ব, গতি ও কক্ষপথ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা তাদের নেই। আগুন, পানি ও বাতাস স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। এমনিভাবে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, তরু-লতা ও বৃক্ষরাজিসহ সকল কিছুই প্রাকৃতিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে তাদের রবের আনুগত্য, দাসত্ব, প্রশংসা ও তাসবীহ করে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলেন :

لاَ يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ. (التحريم : ٦)

"আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না। বরং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই পালন করে"। (আততাহরীম : ৬)

সাধারণভাবে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেন :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ. وَإِنْ مِنْ شَيْئٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ. (بَنِي إِسْرَائِيْلَ : ٤٤)

"সাত আসমান ও জমিন এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে সবই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে। এমন কোনো জিনিস নেই, যা তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করছে না।

কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই সহনশীল ও ক্ষমাশীল"। (সূরা বানী ইসরাঈল : ৪৪)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. (النُّوْرُ : ٤١)

"তুমি কি দেখতে পাওনা যে, আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা এবং পাখা মেলে যে পাখিরা উড়ে বেড়ায় তারা আল্লাহর তাসবীহ্ করছে? প্রত্যেকেই তার নিজের নামায ও তাসবীহের নিয়ম জানে। এরা সব যা কিছু করে তা আল্লাহ জানেন।" (সূরা আন নূর : ৪১)

সৃষ্টিজগৎ এর মধ্যে মানুষ ও জিন জাতির জীবনে প্রাকৃতিক ও শারী'য়া দু'টি বিধানই কার্যকর ও চলমান। যেমন মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে কার্য ও কর্তব্য (Function) আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তারা তাই পালন করে। পৃথিবীর সকল শক্তি একত্রিত হয়ে চেষ্টা করলেও কান দ্বারা দেখা, চোখ দ্বারা শুনা, জিহ্বা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ ও নাক দ্বারা কথা বলা ও স্বাদ আস্বাদনের কাজ গ্রহণ করাতে পারবে না। মানুষের সৃষ্টি, অস্তিত্ব, ক্রমবৃদ্ধি, জীবন-ধারণের পদ্ধতি, উপায়-উপকরণ, জীবনের সময়সীমা ও বিলুপ্তি সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষ নিজ চেষ্টাবলে তার যৌবনকে ধরে রাখতে পারে না, বৃদ্ধকে যুবক বানাতে পারে না, কালো চামড়াকে সাদা ও সাদা চামড়াকে কালো বানাতে পারে না, নিজ চেহারা ও আকৃতির পরিবর্তন করতে পারে না এবং মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারে না।

এমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টি চন্দ্র, সূর্য, বাতাস, পানি, আগুন, মাটি, খাদ্য ও অন্যান্য অসংখ্য প্রকারের নিয়ামত ছাড়া সে বেঁচে থাকতে পারে না। উপরোক্ত সামগ্রিক বিষয়ে মানুষ বাধ্যগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধানের অনুসরণ করে যাচ্ছে, যার ব্যতিক্রম কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। পক্ষান্তরে শারী'য়ার বিধানের বেলায় তাকে দেয়া হয়েছে ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা। এ ক্ষেত্রে সে তার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে। সে ঈমান অথবা কুফরি যে কোনোটি ইখতিয়ার করতে পারে। সে ইচ্ছে করলে নামায প্রতিষ্ঠা, রোযা রাখা, হাজ্জ আদায়, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, পরোপকার করা ইত্যাদি আল্লাহর আদেশকৃত উত্তম কাজ ও ইবাদতসমূহ পালন করতে পারে অথবা তা বর্জনও করতে পারে। এমনিভাবে সে ইচ্ছে করলে

মিথ্যা, প্রতারণা, দুর্নীতি, যুলুম-অত্যাচার ও অন্যান্য সকল নিষেধকৃত কাজসমূহ বর্জন করতে পারে অথবা তা করতেও পারে। আর এরই ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে তাকে শাস্তি অথবা শান্তি দান করবেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا تَشَاؤُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ. (الدهر : ٣٠)

"আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা অন্য কোনো ইচ্ছা পোষণ করতে পারো না।" (সূরা আদদাহ্‌র : ৩০)

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وَمَنْ يُّرِدْ أَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ. (الأنعام : ١٢٥)

"আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান তিনি তার মন ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর তিনি যাকে বিপথগামী করতে চান তার মন সংকীর্ণ– অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন যে, (ইসলামের কথা শুনলেই তার এরূপ মনে হয় যে,) তার আত্মা যেন আসমানের দিকে উড়ে যাচ্ছে।" (সূর আল-আন'আম : ১২৫)

مَنْ يَّشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. (الأنعام : ٣٩)

"আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন আর যাকে চান সরল সঠিক পথে চালান।" (সূরা আল-আন'আম : ৩৯)

إِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ. (القصص : ٥٦)

"হে নবী! আপনি যাকে চান তাকেই হেদায়াত করতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকেই হেদায়াত করেন। আর তিনি হেদায়াত কবুলকারীদেরকে ভালো করেই জানেন।" (আল কাসাস : ৫৬)

নূহ (আ) তাঁর কাওমকে লক্ষ্য করে যে কথা বলেছিলেন তা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ إِنْ أَرَدْتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يُّغْوِيَكُمْ. (هود : ٣٤)

"আল্লাহ যদি তোমাদেরকে পথহারা করার ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি তোমাদের কোনো কল্যাণ করতে চাইলেও আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না।" (সূরা হূদ : ৩৪)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُوْلَ "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ، ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ. قَالَ : فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! آمَنَّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهٖ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللّٰهِ تَعَالٰى يُقَلِّبُهَا." (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিক পরিমাণে বলতেন : "হে মনসমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার মনকে ইসলামী জীবন বিধানের ওপর অটল অবিচল রাখো।" বর্ণনাকারী বলেন : আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার ওপর এবং আপনার আনীত জীবন বিধানের ওপর ঈমান এনেছি। আপনি কি (এরপরও) আমাদের ব্যাপারে ভয় পোষণ করেন? তিনি বলেন : "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনসমূহ আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের দুইটি আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি (নিজ ইচ্ছা মুতাবিক) তা পরিবর্তন করেন।" (আহ্‌মাদ ও তিরমিযী)

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "مَا مِنْ قَلْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، إِذَا شَاءَ أَنْ يُّقِيْمَهُ أَقَامَهُ، وَإِذَا شَاءَ أَنْ يُّزِيْغَهُ أَزَاغَهُ" وَكَانَ يَقُوْلُ : "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ" قَالَ : "وَالْمِيْزَانُ بِيَدِ الرَّحْمٰنِ يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ". (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

নাওয়াস ইবনু সামআন কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : "প্রতিটি মনই সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব দয়াময়ের আঙ্গুলসমূহের দুইটি আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি চাইলে তাকে হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন অথবা তাকে পথভ্রষ্ট করেন।" তিনি বলতেন : "হে মনসমূহের পরিবর্তনকারী! তুমি আমাদের মনকে ইসলামী জীবন বিধানের ওপর স্থির রাখো।" তিনি বলেন : "পাল্লা রাহমানের হাতেই অবস্থিত। তিনি (নিজ ইচ্ছা মুতাবিক) তাকে উঁচু-নিচু করেন।" (নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "إِنَّ قُلُوْبَ بَنِيْ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَصْرِفُ كَيْفَ يَشَاءُ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ! صَرِّفْ قُلُوْبَنَا إِلٰى طَاعَتِكَ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : "নিশ্চয়ই বানু আদমের মনসমূহ রাহমানের আঙ্গুলসমূহের দুইটি আঙ্গুলের মাঝে একটি মনের মতো অবস্থিত। তিনি যেভাবে চান তাকে সেভাবে পরিচালিত করেন।" তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "হে মনসমূহের পরিচালনাকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের মনকে তোমার আনুগত্যের পথে পরিচালিত করো।" (মুসলিম)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের বাহ্যিক অর্থ থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, হিদায়াত ও গোমরাহী, পাপ ও পুণ্য এবং ভালো-মন্দ ইত্যাদির ব্যাপারে বান্দার কোনো ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা নেই। বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তেই বান্দা ভালো-মন্দ সব কিছুই করে। এমতাবস্থায় মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে বান্দা শাস্তি ও শান্তির উপযুক্ত হবে কিসের ভিত্তিতে?

এ প্রশ্নের উত্তর জানার পূর্বে প্রথমেই আমাদের মনে এ কথা বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর কোনো কথার মধ্যেই বিন্দুমাত্র সংঘর্ষ ও স্ববিরোধিতা নেই। যেহেতু আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। সকল প্রকারের জাগতিক ও বৈষয়িক দুর্বলতা থেকে তিনি মুক্ত। অতএব ঐ অসীম ও অবিনশ্বর সত্তার কথা ও কাজে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি ও দুর্বলতার কথা কল্পনাও করা যায় না।

আর তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে অধিক যোগ্য, স্থিতিশীল ও মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাসূল হিসেবে মনোনয়ন করেছেন, যিনি দ্বীন ও শারী'য়ার প্রতিটি কথা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ওহীর ভিত্তিতে বলেছেন। অতএব তাতে কোনো প্রকারের দুর্বলতা, ত্রুটি ও স্ববিরোধিতা থাকা সম্ভব নয়। সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা না জানার কারণে কুরআন ও হাদীসের কোনো কথার মাঝে বাহ্যত কোনো স্ববিরোধিতা আছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তাতে কোনো স্ববিরোধিতা নেই।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব :

আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ জাল্লা জালালুহ জড় ও জাগতিক সর্বপ্রকারের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। সসীম ও ইহজাগতিক হিসাব ও অনুমান দ্বারা তাঁর অসীম কুদরতকে বুঝা ও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অতএব তাঁর অসীমত্বের ধারণা ও অনুভূতি দিয়েই তাঁর কোনো কথা ও কাজকে উপলব্ধি করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে পরবর্তীতে তাঁর সৃষ্ট সমগ্র সৃষ্টির বৃত্তান্তসমূহ নির্ধারণ ও সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ প্রতিটি সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংঘটিতব্য সমস্ত বিবরণ নির্ধারণ ও স্থির করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : "قَدَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَقَادِرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ." (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমগ্র সৃষ্টির পরিমাণসমূহ নির্ধারণ ও স্থির করেছেন যখন তাঁর আরশ পানির ওপর অবস্থিত ছিলো।" (মুসলিম)

প্রতিটি সৃষ্টির বেলায় পূর্ব থেকে নির্ধারিত অবস্থার বিন্দু পরিমাণ ব্যতিক্রম কিছুই ঘটেনা। তবে প্রাকৃতিক বিধান ও শারী'য়ার বিধানের বেলায় তাঁর এ নির্ধারণের (তাকদীর) মাঝে পার্থক্য আছে। তা হলো, প্রাকৃতিক বিধানের ক্ষেত্রের নির্ধারণ এককভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়েছে, যাতে কোনো সৃষ্টিরই ইচ্ছা-অনিচ্ছার

কোনো দখল নেই। আর শারী'য়ার বিধানের ক্ষেত্রে মানুষ ও জিন জাতির ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ভিত্তিতে তিনি তাদের প্রকৃত সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ প্রতিটি জিন ও ইনসান পৃথিবীতে আসার পর শারী'য়ার বিধানের বেলায় তাকে প্রদত্ত ইখতিয়ার ও স্বাধীনতার প্রয়োগ সে কিভাবে করবে তা আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই ভালোভাবে জানেন। আর এরই ভিত্তিতে তিনি আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে প্রতিটি জিন ও ইনসানের নেককার বা গুনাহগার হওয়া এবং আখেরাতে তার জান্নাতী অথবা জাহান্নামী হওয়া নির্ধারণ করে রেখেছেন।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলতে এই তাকদীরকেই বুঝানো হয়েছে যা বান্দার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও ইখতিয়ারের ভিত্তিতে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অর্থাৎ বহু পূর্বেই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের বিপরীত বান্দা কিছুই করতে পারে না।

আয়াত ও হাদীসসমূহে বান্দার ইচ্ছা ও ইখতিয়ারকে বিলুপ্ত করা বা তাকে অক্ষম ও বাধ্য করা অথবা তার ইখতিয়ারের বিপরীত কোনো কিছু তার ওপর চাপিয়ে দেয়ার কথা বুঝানো হয়নি। যেহেতু শারী'য়ার বিধানের বেলায় আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে বাধ্য করেন না। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ. (الأنعام : ١١٢)

"আপনার রব যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ওরা তা করতো না।" (সূরা আল-আন'আম : ১১২)

অর্থাৎ কুফরিতে লিপ্ত থাকতো না।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ. (يونس : ٩٩)

"আপনার রব যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে পৃথিবীর সবাই ঈমান আনতো। আপনি কি তাদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন?" (সূরা ইউনুস : ৯৯)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً. (هود : ١١٨)

"আপনার রব যদি চাইতেন তাহলে সব মানুষকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন।" (সূরা হূদ : ১১৮)

فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ. (الأنعام : ١٤٩)

"আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করতেন।" (সূরা আল-আন'আম : ১৪৯)

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ. (الأنعام : ١١١)

"যদি আমি তাদের ওপর ফেরেশতাও নাযিল করতাম, যদি মৃত মানুষও তাদের সাথে কথা বলতো এবং তাদের সামনে যদি দুনিয়ার সব জিনিসও জমা করে দিতাম তবুও তারা (নিজের ইচ্ছায়) ঈমান আনতো না। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে বাধ্য করলে আলাদা কথা। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই জাহিলের মতো কথা বলছে।" (সূরা আল-আন'আম : ১১১)

উপরের আয়াতসমূহে 'আল্লাহর ইচ্ছা' (مَشِيْئَةٌ) বাধ্য করা (إِجْبَارٌ وَإِكْرَاهٌ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান ও কুফরি গ্রহণ করা ও না করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকেই বাধ্য করেন না। বরং তা বান্দার ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব ঈমান ও কুফরি, পাপ ও পুণ্যের ইহ ও পরকালীন পরিণতি সম্পূর্ণরূপে বান্দারই উপার্জিত ও প্রাপ্য। এতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওপর বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيْدِ. (حم السجدة : ٤٦)

"যে নেক আমল করবে সে নিজের জন্যই ভালো করবে। আর যে বদ আমল করবে এর পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। (হে নবী!) আপনার রব বান্দাদের উপর যুলুম করেন না।" (সূরা হামীম আসসাজদা : ৪৬)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. (البقرة : ٢٨٦)

"প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী কামাই করেছে তার ফল তারই জন্য, আর যে পাপ জমা করেছে তার পরিণামও তারই ওপর।" (সূরা আল বাকারা : ২৮৬)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعٰى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفٰى. (النجم : ٣٩-٤١)

"আর মানুষ যার জন্য চেষ্টা করেছে তা ছাড়া তার জন্য আর কিছুই নেই। তার চেষ্টা-সাধনা শিগ্‌গিরই দেখা হবে। তারপর এর পুরা বদলা তাকে দেয়া হবে।" (সূরা আন নাজ্‌ম : ৩৯-৪১)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ. (الزلزال : ٧، ٨)

"অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল : ৭ ও ৮)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهِ. وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ. (الشورى : ٢٠)

"যে কেউ আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সে ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই। কিন্তু আখেরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না।" (সূরা আশশূরা : ২০)

فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ. (يونس : ١٠٨)

"অতএব যে সঠিক পথে চলবে তার সত্য পথে চলা তার জন্যই উপকারী হবে। আর যে পথহারা হবে তার পথভ্রষ্টতা তার জন্যই ক্ষতিকর হবে। আমি তোমাদের ওপর কোনো কর্মবিধায়ক নই।" (সূরা ইউনুস : ১০৮)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أٰذَانٌ لاَ يَسْمَعُوْنَ بِهَا، أُولٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، أُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ. (الأعراف : ١٧٩)

"অনেক জিন ও ইনসানকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের মন আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা (দ্বীন ও হেদায়াতকে) উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা (আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনসমূহ) দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা (হেদায়াতের বাণী) শুনে না। তারা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও অধম। এরাই ঐসব লোক, যারা গাফলতির মধ্যে পড়ে আছে।" (সূরা আল আ'রাফ : ১৭৯)

عَنْ أَبِى ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِى عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَنَّهُ قَالَ : "..... يَا عِبَادِىْ! إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আবু যর জুনদুব ইবনু জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : "হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের আমলকে তোমাদের জন্য হিসাব ও সংরক্ষণ করে রাখছি, তারপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেবো। কাজেই যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণ পায়, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।" (মুসলিম)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বান্দা সম্পূর্ণ নিজের ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় ভালো-মন্দ সকল কাজ করে। আর তারই প্রতিফল সে দুনিয়া ও আখেরাতে ভোগ করে।

শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা

কখনো কখনো কাউকে বলতে শুনা যায় যে, 'আরে রাখো, এতো কিছু করে কোনো লাভ নেই অথবা এতো চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রতিটি মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের ভালো-মন্দ সব কিছুই বহু আগেই সাব্যস্ত হয়ে আছে।'

এটি চরম অজ্ঞতাপ্রসূত কথা, যা শয়তান বান্দাকে ধ্বংস করার জন্য তার মুখে জারি করে দেয়। নিম্নে এ বিভ্রান্তির জবাব দেয়া হলো।

'আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তাদের সাধ্য মুতাবিক আমল ও ইবাদত করার জন্য আদেশ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ. (التغابن : ١٦)

"অতএব তোমরা সাধ্য মুতাবিক আল্লাহকে ভয় করে চলো, শুনো, আনুগত্য করো এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণার্থে (আল্লাহর রাস্তায়) অর্থ ব্যয় করো।" (আততাগাবুন : ১৬)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. (البقرة : ٢١)

"হে মানুষ! তোমাদের ঐ রবের দাসত্ব করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের আগে যারা চলে গেছে তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই তোমরা রক্ষা পেতে পারো।" (আল বাকারাহ : ২১)

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ، وَسَتُرَدُّوْنَ إِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. (التوبة : ١٠٥)

"হে রাসূল! তাদেরকে বলে দিন : তোমরা আমল করো। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ সবাই তোমাদের আমল প্রত্যক্ষ করবেন। এরপর তোমাদেরকে তার

কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে, তোমরা কেমন আমল করেছিলে।" (আততাওবা : ১০৫)

وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ. (البينة : ٥)

"তাদেরকে এ ছাড়া অন্য হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই সঠিক মযবুত দ্বীন।" (আল বায়্যিনাহ : ৫)

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرٰى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ." (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আদী ইবনু হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অচিরেই তার রব কথা বলবেন এমন অবস্থায় যে, উভয়ের মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। মানুষ তার ডান দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, সামনে তাকাবে তো মুখের সামনে আগুন দেখতে পাবে। কাজেই খেজুরের একটি টুকরা দান করে হলেও তোমরা আগুন থেকে বাঁচো। আর যে ব্যক্তি তাও না পায় সে একটি ভালো কথা দ্বারা (হলেও আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত)।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে বান্দাদেরকে সাধ্য মুতাবিক একনিষ্ঠভাবে আমল করার জন্য আদেশ ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি বান্দার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই কি স্থির ও সাব্যস্ত করে রেখেছেন সে সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করা বান্দার দায়িত্ব নয়। বরং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা

করতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। তাকদীরের ওপর শুধুমাত্র ঈমান পোষণ করাই বান্দার দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বহু পূর্বেই কি সাব্যস্ত করে রেখেছেন সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াই প্রতিটি বান্দাকে তার সাধ্য মুতাবিক আমল করে যাওয়ার জন্য তিনি যেমনি আদেশ করেছেন তেমনি দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ দান ও অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা দান করার জন্য সর্বদা দু'আ করার নির্দেশও তিনি বান্দাকে দিয়েছেন। যেহেতু কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তার অনেক বান্দাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দানে ধন্য করবেন আর অনেক বান্দাকে দুনিয়া ও আখেরাতের অকল্যাণ দান করে করবেন হতভাগ্য। অতএব হতভাগ্যদের মধ্যে আমাদেরকে শামিল না করে কল্যাণপ্রাপ্ত ধন্য ও ভাগ্যবানদের মধ্যে শামিল করার দু'আ হবে আমাদের জন্য মহান ইবাদত।

খ. আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মতদের মধ্যে কারো কারো ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে আখেরাতের নাজাত ও জান্নাতের সুসংবাদ দান করা ছাড়া সাধারণভাবে সুনির্দিষ্ট কোনো মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করা বা না করার কথা ঘোষণা করেননি। আর আল্লাহ তা'আলা কার ভাগ্যে ভালো-মন্দ কি লিখে রেখেছেন তা কারো জানা নেই। এমতাবস্থায় অহেতুক তাকদীরের ব্যাপারে কল্পনাপ্রসূত কোনো কিছু নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়ে আল্লাহর আদেশকৃত কাজসমূহ বর্জন করে বা তাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে নিজেকে মাহরূম করা চরম নির্বুদ্ধিতা ও পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

গ. তাকদীর সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা ও উক্তি যে সরাসরি শয়তানের ধোঁকা ও চক্রান্ত তার প্রমাণ হলো :

ঈমান, নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, বাস্তব জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর হুকুম মেনে চলা তথা দ্বীন ও ইবাদত ইত্যাদি বিষয়েই সাধারণত তারা তাকদীরের প্রশ্ন উত্থাপন করে। এ ছাড়া বৈষয়িক জীবনের কর্মকাণ্ড যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, কৃষি, জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা, লেখা-পড়া, ঘর-সংসার ইত্যাদি বিষয়ে তারা কখনো তাকদীরের প্রশ্ন উত্থাপন করে না। বরং এ সকল বিষয়ে তারা তাদের যোগ্যতা, প্রতিভা ও শক্তির পুরাটাই অকপটে ও প্রশ্নাতীতভাবে প্রয়োগ করে।

একজন শিক্ষার্থী তার জীবনের ১৫/২০ বছর সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে কোনো বিষয়ে সার্টিফিকেট অর্জন করার পর সে বেঁচে থাকবে কিনা? সুস্থ থাকবে

কিনা? নিরাপদ থাকবে কিনা? কোনো চাকরি পাবে কিনা? জীবনটাকে উপভোগ করার সুযোগ পাবে কিনা? ইত্যাদি ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ও অজানা বিষয়সমূহের প্রশ্নাবলী তার মনে উদয় হয় না এবং এসব বিষয়ে সে কখনো দ্বিধা ও বিতর্কে লিপ্ত হয় না। বরং দুনিয়ার জীবনটাকে তৃপ্তিভরে উপভোগ করার পরম আশা ও নেশায় সে লেখাপড়ায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য তার মেধা, প্রতিভা ও সামর্থ্যকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগায়।

কোনো প্রচার মিডিয়ায় যে কোনো সংস্থায় একটি ভালো চাকরিতে নিয়োগ দানের সংবাদ বা বিজ্ঞপ্তি দেখার পর উক্ত চাকরিতে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থী তার সমস্ত চেষ্টা ও যোগ্যতাকে অকপটে কাজে লাগায়। ইন্টারভিউতে সে পাশ করবে কিনা? পাশ করার পর অফিসিয়াল নিয়মাবলী সম্পন্ন করে কাজে যোগদান করা পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কিনা? পূর্ণ একটি মাস চাকরি করার পর বেতন হাতে গ্রহণ করা পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে কিনা? নাকি বেতন হাতে গ্রহণ করার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যাবে? অথবা বেতন পাওয়ার পর তা দ্বারা তার প্রয়োজন ও চাহিদাসমূহ পূরণ করে সুখ ও তৃপ্তি লাভ করার সুযোগ পাবে কিনা? তাকদীরের উক্ত অজানা ও অনিশ্চিত বিষয়সমূহের প্রশ্নাবলী কোনো প্রার্থীর মনেই ঘুণাক্ষরেও উদয় হয় না।

একজন ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ লাভ পাওয়ার আশায় বিরাট অঙ্কের পুঁজি ব্যবসায় নিয়োগ করেই ক্ষান্ত হয় না। বরং মুনাফা লাভের আশায় তার চিন্তা, বুদ্ধি, যোগ্যতা, কৌশল, সময় ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগায়। সে এক মুহূর্ত পর বেঁচে থাকবে কিনা? ব্যবসায় সে লাভবান হবে কিনা? লাভবান হলে উক্ত লাভ দ্বারা সে সুখ ও তৃপ্তি ভোগ করার সুযোগ পাবে কিনা? ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ মনের মধ্যে উদয় হয়ে তার চেষ্টাকে যেমন বিন্দুমাত্র প্রভাবিত ও বাধাগ্রস্ত করে না, তেমন কষ্টার্জিত মুনাফা দ্বারা সুখ ও তৃপ্তি ভোগ করার প্রবল ও অদম্য আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে বিন্দুমাত্র দুর্বল ও স্তিমিতও করে দেয় না।

কোনো ঘরের ভেতর অবস্থানকারী একজন ব্যক্তি বাইরের লোকজনের চিৎকার ও হৈ হুল্লোড় শুনে দরজা খুলে দেখে যে, তার ঘরের চারপাশে আগুন লেগেছে। আগুনের মাত্রা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তার প্রকাণ্ড লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে প্রচণ্ড বেগে তার দিকে ধেয়ে আসছে, যা ক্ষণিকের মধ্যেই তাকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেবে। এমতাবস্থায় ঘুণাক্ষরেও তার মনে তাকদীর সম্পর্কে এ বিতর্ক সৃষ্টি হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা কি এ আগুন থেকে বাঁচাটা আমার কপালে লিখে রেখেছেন নাকি এ আগুনে জ্বলে মরাটা লিখে রেখেছেন? অথবা ঘরের মধ্যেই

নীরব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে এ কথা বলে না যে, আল্লাহ যদি এ আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমার তাকদীরে ইচ্ছা ও চেষ্টা করাটা লিখে থাকেন তাহলেই আমি ইচ্ছা ও চেষ্টা করবো। অতঃপর নিজ জায়গাতেই বসে থেকে শান্ত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধুঁকে ধুঁকে আগুনে জ্বলে মরে। না, কস্মিনকালেও এমনটি ঘটেনা। বরং প্রচণ্ড লেলিহান শিখার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে যেয়ে আগুনে জ্বলে মরে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা জেনেও সে ঐ আগুনের ভেতর দিয়েই দৌড়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে।

বনের পাশ দিয়ে চলার সময় একজন পথিক পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে যে, দূর থেকে একটি হিংস্র সিংহ তার দিকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। এমতাবস্থায় মরা-বাঁচার বিষয়টি তাকদীরের ওপর ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্তে শান্ত ও ধীর গতিতে চলতে থাকে না। বরং চলার গতি ও দেহের শক্তি কোনোটিতেই সিংহের সাথে কুলিয়ে ওঠতে পারবে না– এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও সে তার দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দৌড়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে।

গহীন সমুদ্রের মাঝে ঝড়ে আক্রান্ত ডুবন্ত জাহাজ থেকে কোনো যাত্রী লাফিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর পাহাড়ের মতো বিশাল বিশাল উত্তাল তরঙ্গমালা তাকে নিয়ে বল খেলা শুরু করে। এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি তার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত জানার অপেক্ষায় নীরব ও নিষ্ক্রিয় থেকে তরঙ্গের মাঝে নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঁপে দেয় না। বরং তার শক্তির চাইতে লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী তরঙ্গমালার সাথে পাল্লা দেয়া সম্ভব হবেনা– এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও সে ঐ মুহূর্তে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে হাত-পা ঝাঁপটিয়ে সাঁতার কেটে বাঁচার চেষ্টা করে।

উপরোক্ত সকল অবস্থায় বান্দা তাকদীরের প্রশ্ন উত্থাপন না করে ইচ্ছা ও মনের নিয়ন্ত্রণকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে তার শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগায়। অথচ তার মহান রব আল্লাহ জাল্লা জালালুহ যখন বলেন যে, তুমি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার আনুগত্য ও দাসত্ব করো। আমার দ্বীন ও বিধানকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথার্থভাবে চেষ্টা ও সংগ্রাম করো। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো এবং অন্যায়কে মিটিয়ে দাও।

তুমি যদি আমার এ আদেশসমূহ বাস্তবায়ন করো তাহলে দুনিয়ার জীবনে আমি তোমাকে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করবো। আর আখেরাতে অনন্ত সুখের জায়গা জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ দান করবো। আর যদি তুমি আমার এ

আদেশসমূহ অমান্য করো তাহলে দুনিয়ার জীবনে আমি তোমাকে অশান্তি ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন করবো এবং আখেরাতে জাহান্নামের কঠিন ও ভয়ানক শাস্তিতে নিমজ্জিত করবো। তখন এ বান্দা তাকদীরের প্রশ্ন তুলে নিজ ইচ্ছা ও মনের নিয়ন্ত্রণকে আল্লাহর হাতে তুলে দিয়ে নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে বসে। এটা কতইনা ভারসাম্যহীন আচরণ। আখেরাতে জান্নাতের অনন্ত ও অসীম সুখের তুলনায় দুনিয়ার সুখ সুখ হিসেবেই গণ্য নয়। অথচ সে দুনিয়ার এ তুচ্ছ সুখ হাসিলের জন্য অকপটে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টা প্রয়োগ করলো। আর আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার কোনো কষ্ট কষ্ট হিসেবেই গণ্য নয়। অথচ সে জাহান্নামের সেই ভয়াবহ শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুমসমূহ পালন করার সামান্য কষ্ট স্বীকার করতে রাযী হলো না। এর চাইতে চরম নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী আর কি হতে পারে ?

মোদ্দাকথা, ভালো-মন্দ যে কোনো কিছুর ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন বান্দাই করে। বান্দা যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সে কাজ করার শক্তি ও ক্ষমতা দান করেন। আল্লাহ যদি চান তাহলে বান্দা কোনো কিছু করার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাকে অক্ষম করে দিতে পারেন। যেহেতু সে তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে। তার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই; বরং তা আল্লাহর দেয়া শক্তি দ্বারাই চলে। আল্লাহ চাইলে ঐ মুহূর্তে ঐসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তিকে রহিত করে তাকে অক্ষম করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সাধারণত তাকে অক্ষম করেন না। বরং বান্দার ইচ্ছা মুতাবিক ভালো-মন্দ যে কোনো কাজেরই শক্তি, ক্ষমতা ও তাওফীক তাকে দান করেন। আর এ জনেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, আমার ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কোনো ইচ্ছা করতে পারো না। এখানে 'আল্লাহর ইচ্ছার' অর্থ হলো কাজ করার শক্তি, ক্ষমতা ও তাওফীক দান। বান্দার ইচ্ছা ও ইখতিয়ারকে রহিত করে তার ওপর আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেয়া এর অর্থ নয়, যা উপরোক্ত উদাহরণসমূহ থেকে দিবালোকের মতো আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, বান্দা যখন কোনো নেক কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন আল্লাহ সন্তুষ্টির সাথে তাকে ঐ কাজের শক্তি ও তাওফীক দান করেন। আর বান্দা যখন কোনো গুনাহের কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন আল্লাহ অসন্তুষ্টির সাথে তাকে ঐ কাজের শক্তি ও তাওফীক দান করেন। আর উক্ত

ভালো-মন্দ উভয় কাজের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ ইনসাফের সাথে তাকে দান করেন।

দুনিয়া ও আখেরাতের ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের যাবতীয় বিষয়াদি বান্দার নিকট স্পষ্ট। ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিটি বিষয়ের ইহ ও পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে সে অবহিত। অতএব নিজের স্বার্থেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর নির্দেশক্রমে সকল ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ ও নেতিবাচক বিষয়াদি বর্জন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা প্রয়োগ করাই তার জন্য সমীচীন ও অপরিহার্য। তাকে সৃষ্টি করার বহু পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার ভাগ্যে ইহ ও পরকালীন কি কল্যাণ ও অকল্যাণ সাব্যস্ত ও নির্ধারণ করে রেখেছেন সে সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করা বা পিছপা হওয়া নিজেকে স্বেচ্ছায় ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ারই শামিল। আর এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। কুরআন ও হাদীসে তাকদীর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার ওপর বান্দাকে শুধুমাত্র পরিচ্ছন্নভাবে ঈমান পোষণ করতে হবে। এ ছাড়া এ বিষয়ে তার করণীয় কিছু আর নেই।

আল্লাহর তাওফীক

তাওফীক (تَوْفِيْق) আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ : অনুরূপ করা, সাযুজ্য বিধান করা, মিল করা, সঙ্গতি বিধান করা, সামঞ্জস্য বিধান করা, খাপ খাওয়ানো, সমন্বিত করা ইত্যাদি।

আর ব্যবহারিক বা পারিভাষিক অর্থ হলো : সফলতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও উন্নতি দান করা ইত্যাদি।

প্রথমোক্ত শাব্দিক অর্থ ভালো ও মন্দ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বান্দা যখন ভালো-মন্দ কোনো কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ মুতাবিক তাকে ঐ কাজটি করার শক্তি ও সুযোগ দান করেন। একেই তাওফীক বলে। পক্ষান্তরে পারিভাষিক অর্থে শুধুমাত্র উত্তম ও ইতিবাচক কাজ ও বিষয়েই তাওফীক শব্দ ব্যবহৃত হয়। মন্দ ও নেতিবাচক কোনো কাজে কেউই তাওফীক কামনা ও প্রার্থনা করে না।

সমগ্র সৃষ্টিজগৎ পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা একটি সাধারণ, সুনির্দিষ্ট ও শাশ্বত নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব সকল কিছুই ঐ নিয়মের অধীনে স্বতঃই পরিচালিত হচ্ছে। জিন ও ইনসানের শার'য়ী জীবন-যাপনের বেলায় আল্লাহর শাশ্বত নিয়ম হচ্ছে : তিনি তাদেরকে একটি স্থায়ী পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত ও হেদায়াত দান করেছেন। আর তা পালন বা অমান্য করার মতো তাদেরকে দান করেছেন সীমিত স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার। যারা তাদের ইখতিয়ার ও ইচ্ছাশক্তিকে আল্লাহর আদেশসমূহ বাস্তবায়ন করার কাজে প্রয়োগ করবে তারা তাঁর সন্তোষ লাভ করে আখেরাতে নাজাত পাবে। আর যারা তাদের ইচ্ছাশক্তিকে আল্লাহর আদেশসমূহ অমান্য ও নিষেধকৃত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করার কাজে প্রয়োগ করবে তারা তাঁর অসন্তোষ লাভ করে আখেরাতে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ভালো ও মন্দ কাজে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বান্দার জীবনে কখনো উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কোনো বান্দা বিশেষ কোনো ইচ্ছা, পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা ছাড়াই স্বপ্রণোদিত হয়ে উত্তম ও মহৎ কাজ সম্পন্ন ও বাস্তবায়ন করে। কেউ জীবনের বিরাট একটি সময় হেদায়াত থেকে বিমুখ, উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় থাকার পর হঠাৎ তার মনে হেদায়াতের আলো জ্বলে উঠে। আর সে হয়ে উঠে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বে সক্রিয়, তৎপর ও

নিবেদিতপ্রাণ। এমনিভাবে কোনো অমুসলিমের মনে হঠাৎ করে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে হেদায়াতের রশ্মি। আর তার মন, চিন্তা, চেতনা, তৎপরতা ও জীবন হয়ে যায় সে আলোয় উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত।

পক্ষান্তরে কোনো বান্দা স্বপ্রণোদিত হয়ে অন্যায় ও পাপাচার করে যায়। কেউ সাধারণ মুসলিম হিসেবে জীবন-যাপন করা অবস্থায় পর্যায়ক্রমে তার অনুভূতি, চেতনা ও আমলের বিকৃতি ও পতন ঘটে। আবার কেউ বা প্রকৃত সত্য ও ন্যায়ের বিরোধী হয়ে যায়। হেদায়াত ও গোমরাহী অবলম্বনের ব্যাপারে উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্য, সহজতা ও স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকট হেদায়াত ও গোমরাহীর বর্ণনা পেশ করার সাথে সাথে উভয়ের ইহ ও পারলৌকিক পরিণতিও সুস্পষ্টভাবে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর হেদায়াত অথবা গোমরাহী যে কোনোটি ইখতিয়ার করার ভার বান্দার ওপরই ন্যস্ত করা হয়েছে। আর এটাই আল্লাহর পক্ষ হতে সাধারণ ও শাশ্বত নিয়ম। একে আরবিতে (إِرَادَةُ الطَّرِيْقِ) 'রাস্তা দেখানো' বলে। কিন্তু উপরোক্ত হেদায়াত ও গোমরাহী অবলম্বনকারী উভয় শ্রেণীর বেলায় এর ব্যত্যয় ঘটেছে। তাদেরকে কেউ যেন হাতে ধরে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। একে আরবিতে (إِيْصَالٌ إِلَى الْمَطْلُوْبِ) 'লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া' বলে।

উপরোক্ত দুইটি অর্থ 'হেদায়াত' শব্দের। 'হেদায়াত ও গোমরাহী' শব্দ, অর্থ ও উদ্দেশ্যগতভাবে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও উপস্থাপনার দিক থেকে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য আছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হেদায়াতের মতো গোমরাহীকেও বান্দার সামনে খুলে বর্ণনা করেছেন। সুনির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে কোনো কোনো বান্দাকে তিনি যেমনিভাবে সরাসরি হেদায়াতের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেন তেমনি কারো কারোকে গোমরাহীর লক্ষ্যস্থলেও পৌঁছিয়ে দেন। যেমনটি আমরা ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি। এবার আমরা এ উভয়ের কারণ জানার প্রয়াস পাবো।

হেদায়াত সহজলভ্য হবার কারণ

(১) হেদায়াত দান ও তার ওপর অটল ও অবিচল রাখার জন্য বান্দার সর্বদা আল্লাহর নিকট দু'আ করা।

এ মর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) অনেক দু'আ শিখিয়েছেন। যেমন :

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ. (اَلْفَاتِحَةُ : ٧-٥)

(হে আল্লাহ!) "আমাদেরকে সোজা সঠিক পথ দেখাও। ঐসব লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দিয়েছো। যাদের ওপর গযব পড়েনি, আর যারা পথহারা হয়নি।" (আল ফাতিহা : ৫-৭)

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. (ال عمران : ٨)

"হে আমাদের রব। তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দান করার পর আমাদের মনকে বাঁকা করে দিও না। আমাদেরকে তোমার পক্ষ হতে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি অসীম দাতা।" (আলে ইমরান : ৮)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَّقُوْلَ : "يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিক পরিমাণে বলতেন : "হে মনসমূহের পরিচালনাকারী! তুমি আমার মনকে তোমার দ্বীনের ওপর স্থির ও অটল রাখো।" (আহ্‌মাদ ও তিরমিযী)

এ ছাড়াও এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে আরো অনেক দু'আ আছে। উপরন্তু নিজ মাতৃভাষায় রবের নিকট পেশকৃত হেদায়াতের দু'আও এর মধ্যে শামিল আছে।

(২) তার জন্য তার পিতা মাতা বা কোনো নেককার বান্দার দু'আ।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ : دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)

"তিনটি দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সেগুলো হচ্ছে :

(পুত্রের জন্য) পিতার দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং মাযলুমের দু'আ।" (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ। আবু হুরায়রা রা.)

এ হাদীসে বর্ণিত 'আল ওয়ালিদ' (اَلْوَالِدُ) অর্থ পিতা। কিন্তু এতে মাতাও শামিল আছে। একে আরবিতে 'তাগলীব' (تَغْلِيْبٌ) বলে। এর অর্থ, প্রাধান্যের ভিত্তিতে একজনের কথা উল্লেখ করে দুইজনকেই উদ্দেশ্য করা।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِيْنَ. وَلَكَ بِمِثْلٍ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "ভাইয়ের অসাক্ষাতে কোনো মুসলমান ব্যক্তির দু'আ তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। যখন ঐ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য কোনো দু'আ করে তখনই ঐ নিযুক্ত দায়িত্বশীল ফেরেশতা বলেন : আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ। (মুসলিম)

এ অর্থে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

(৩) তার জন্য ফেরেশতাদের দু'আ।

যেসব মুমিন অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থেকে আল্লাহর পথের অনুসরণ করে ফেরেশতারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য তাদের রবের নিকট দু'আ করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. (الْمُؤْمِنُ : ٩-٧)

"আল্লাহর আরশের বাহক ফেরেশতারা এবং যারা আরশের চারপাশে আছে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের তাসবীহ করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের গুনাহ মাফ চেয়ে দু'আ করে, হে আমাদের রব! তোমার রহমত ও ইলম নিয়ে প্রতিটি জিনিসের ওপর তুমি চেয়ে আছো। কাজেই যারা তাওবা করেছে ও তোমার পথে চলছে তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। হে আমাদের রব! তাদরেকে ঐ চিরস্থায়ী বেহেশতে প্রবেশ করাও, যার ওয়াদা তুমি তাদের সাথে করেছিলে। আর তাদের বাপ-মা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক আমল করেছে (তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌছিয়ে দাও)। নিশ্চয়ই তুমি মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী। আর সকল মন্দ কাজ থেকে তুমি তাদেরকে বাঁচাও। কিয়ামতের দিন তুমি যাকে মন্দ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছো, তার ওপর তুমি বড়ই রহম করেছো, আর এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (আল মুমিন ঃ ৭-৯)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرَ". (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "যারা লোকদেরকে দ্বীনের ইলম শিখায়, আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ, পৃথিবী ও আকাশের অদিবাসীবৃন্দ, এমনকি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া ও (পানির) মাছেরাও তাদের জন্য দু'আ করে।" (তিরমিযী)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلٰى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ". (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "তোমাদের কোনো ব্যক্তি যখন নামায পড়ার পর নিজের জায়নামাযে বসে থাকে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকেন যতক্ষণ তার উযু ভেঙ্গে না যায়। ফেরেশতারা বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! একে মাফ করো, এর ওপর রহম করো।" (বুখারী)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلٰى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ : "لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ" وَكَانَ يَقُوْلُ : "إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأَوَلِ". (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) কাতারের মাঝখান দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত লাগাতেন ও বলতেন : "আগে-পিছে হয়ে যেয়ো না, তাহলে তোমাদের মনও বিভিন্ন হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলতেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথম কাতারগুলোর ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা (তাদের জন্য) দু'আ করেন।" (আবু দাউদ)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلٰى سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ". (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) যখন সা'দ ইবনু উবাদার নিকট আসেন। সা'দ (রা) তাঁর রুটি ও যয়তূনের তেল নিয়ে আসেন। তিনি তা আহার করেন। তারপর নবী (সা) বলেন : "তোমার কাছে রোযাদাররা ইফতার করলো, নেককাররা তোমার খাদ্য আহার করলো এবং ফেরেশতারা তোমার জন্য দু'আ করলো।" (আবু দাউদ)

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য নেক আমল আছে যার জন্য ফেরেশতারা বান্দার জন্য দু'আ করেন।

(৪) সৃষ্টিজগতের উপকার ও কল্যাণ সাধন করা এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা।

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللّٰهِ، فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللّٰهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ". (رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو يَعْلٰى وَالطَّبَرَانِىُّ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِى الدُّنْيَا)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারভুক্ত। যে তাঁর পরিবারের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকার ও কল্যাণ সাধনকারী সে তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়।" (আবু নু'আঈম, আবু ইয়া'লা, তাবারানী, বায্যার ও ইবনু আবিদ্ দুনইয়া)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللّٰهِ، وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللّٰهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلٰى عِيَالِهِ". (رَوَاهُ الطَّبَرَانِىُّ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِىُّ)

ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারভুক্ত। যে তাঁর পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণ করে সৃষ্টির মধ্যে সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়।" (তাবারানী, আবু নু'আঈম ও বাইহাকী)

হাদীসদ্বয়ে সৃষ্টি বলতে জিন ও ইনসানসহ অন্যান্য সকল সৃষ্টিকেই বুঝানো হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সকল প্রকারের উপকার সাধন ও উত্তম আচরণের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সকল সৃষ্টিজগতই উপকৃত হয়।

(৫) অহংকার, হিংসা ও অন্যান্য বড় বড় পাপাচার থেকে মুক্ত থাকা।

মানুষের মনটি হচ্ছে একটি ক্ষেতস্বরূপ। ক্ষেত আগাছা-পরগাছা থেকে যতো বেশি মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকে ততোই তা উপকারী গাছ, তরু-লতা ও ফসল উৎপন্ন হওয়ার জন্য উপযোগী ও প্রস্তুত থাকে। তেমনি মন গুনাহ ও পাপাচারের কালিমা থেকে পরিচ্ছন্ন থাকলে তাও হেদায়াত গ্রহণ করার জন্য উপযোগী ও প্রস্তুত থাকে।

উপরোক্ত কোনো কারণ ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোনো বান্দাকে সরাসরি

হেদায়াত দান করেন, যার প্রকৃত কারণ, রহস্য ও হিকমত একমাত্র তিনিই জানেন। মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এর বাহ্যিক কোনো কারণ ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তবে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ ইনসাফ ও সততার সাথেই তা করেন। মোদ্দাকথা, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে সরাসরি হেদায়াত দান করাটা নিঃসন্দেহে তার জন্য পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কোনো বান্দাকে সঠিক ও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেই তাকে সরাসরি হেদায়াত ও উত্তম কাজের তাওফীক দান করেন। চাই তার কারণ মানুষের নিকট জ্ঞাত হোক অথবা অজ্ঞাতই হোক। অতএব প্রতিটি বান্দাকেই সর্বদা আল্লাহর নিকট বিশেষ হেদায়াত ও নেক কাজ করার তাওফীক দান করার জন্য দু'আ করা উচিত।

গোমরাহী সহজলভ্য হবার কারণ

(১) অন্যায় ও পাপ কাজের প্রতি আগ্রহ, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা পোষণ করা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ، أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ، فِي الْأٰخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. (هُوْدٌ : ١٦-١٥)

"যারা শুধু দুনিয়ার এ জীবন ও এর সাজ-সজ্জা চায়, তাদের কাজ-কর্মের ফল আমরা এখানেই দিয়ে দেই এবং এতে তাদের সাথে কোনো কমতি করা হয় না। এরাই ঐসব লোক, যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (সেখানে জানতে পারবে যে,) তারা যা কিছু দুনিয়াতে বানিয়েছিল তা সবই বিফলে গেলো এবং যা তারা করেছিল তা সবই বাতিল হয়ে গেলো।" (হূদ ঃ ১৫, ১৬)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا. (الإِسْرَاءُ : ١٨)

"যে দুনিয়া হাসিল করতে চায় আমি তাকে আমার ইচ্ছা মাফিক তা দিয়ে দেই। তারপর (আখেরাতে) তার জন্য জাহান্নাম সাব্যস্ত করে দেই, যেখানে সে অপমানিত ও অভিশপ্ত অবস্থায় জ্বলবে।" (আল ইসরা ঃ ১৮)

إِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُوْنَ. أُولٰئِكَ هُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. (يونس : ٨-٧)

"নিশ্চয়ই যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা করে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে বেখবর, তাদের এ ভুল আকীদা ও আমলের কারণে দোযখই হবে তাদের শেষ ঠিকানা।" (ইউনুস ঃ ৭, ৮)

إِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْأٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ. (النَّمْلُ : ٤)

"নিশ্চয়ই যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তাদের আমলকে আমি তাদের চোখে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছি। তাই তারা দিশেহারা হয়ে ফিরছে।" (আন নামল ঃ ৪)

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত আছে। উপরোক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, যারা আখেরাতের কথা ভাবে না, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা করে না, বরং দুনিয়ার জীবনের সুখ-সম্ভোগ নিয়েই তুষ্ট ও ব্যস্ত থাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা মুতাবিক তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের সুখ-শান্তি দান করেন। দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে সকল প্রকারের তৎপরতাকে তাদের নিকট চাকচিক্যময়, শোভনীয় ও লোভনীয় করে দেন। আর এর বিনিময়ে আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তিকে তাদের জন্য অবধারিত করে দেন।

(২) কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ. (الْجَاثِيَةُ : ٢٣)

"তুমি কি কখনো ঐ লোকের হাল সম্পর্কে ভেবে দেখেছো, যে তার কুপ্রবৃত্তিকে তার ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে। আর আল্লাহ ইলমের ভিত্তিতেই তাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন। তার কান ও দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখে পর্দা ফেলে

দিয়েছেন। আল্লাহর পর আর কে আছে যে তাকে হেদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করবে না?" (আল জাসিয়া ঃ ২৩)

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. (الْكَهْفُ : ٢٨)

(হে রাসূল!) "আপনি এমন লোকের কথা মতো চলবেন না, যার মনকে আমার যিক্‌র থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করছে এবং সীমালঙ্ঘন করাই যার কর্মনীতি।" (আল-কাহফ ঃ ২৮)

যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) প্রদত্ত কুরআন ও হাদীসের কর্মসূচী বাদ দিয়ে নিজের নাফ্‌স বা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে গোমরাহ করে দেন। তার কান ও মনে মোহর মেরে দেন এবং চোখে আবরণ ঢেলে দেন। অতএব তার কানে হেদায়াতের বাণী প্রবেশ করে না এবং মনে তা কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। আর আল্লাহর কুদরতের অসংখ্য বিস্ময়কর নির্দশনাবলী দেখা সত্ত্বেও সে তা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না।

(৩) তার ওপর সাধারণ মানুষের মনবেদনা ও বদদু'আ।

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির পাপাচারের কারণে সাধারণ মানুষ কষ্ট পায়। আর এরই কারণে সে আল্লাহর আযাব ও গযবের উপযুক্ত হয়ে যায়। কুরআন মাজীদের ভাষ্য অনুসারে পাপ কাজকে চাকচিক্যময় করে দিয়ে অবাধে পাপ কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়াও বান্দার প্রতি আল্লাহর গযবের বহিঃপ্রকাশ।

(৪) ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টিজগতের তার ওপর লা'নত করা।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর হেদায়াতকে অস্বীকারকারীর ওপর ফেরেশতা ও অন্যান্য সকল সৃষ্টিজগৎ লা'নত করে, যেমনিভাবে হেদায়াতের অনুসারী অনুগত বান্দার জন্য তারা সবাই দু'আ করে। যেহেতু তারা সবাই মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দা।

আল্লাহর আনুগত্যের বিপরীত যে কোনো কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা দ্বারা তারা প্রভাবিত ও ব্যথিত হয়। অতএব তাদের লা'নতের কারণে অবাধ্য বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে যেমনি শাস্তি অবধারিত করেন তেমনি দুনিয়াতেও তাকে শাস্তিস্বরূপ গোমরাহ করে পাপ কাজের সুযোগ দান করেন।

উপরোক্ত কারণসমূহ ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে সরাসরি গোমরাহ করেন, যার সঠিক কারণ ও হিকমত একমাত্র তিনিই জানেন। বাহ্যিক কোনো

কারণ ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে না পারলেও আমরা অকুণ্ঠচিত্তে একথা বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয়ই সকল জ্ঞানের আঁধার আল্লাহ জাল্লা জালালুহূ সম্পূর্ণ ইনসাফের সাথেই তা করেন। যেহেতু কাউকে উপযুক্ত পেয়েই তিনি তাকে সরাসরি গোমরাহ করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে পাপ কাজ করার তাওফীক বা সুযোগ দান করেন তা তার জন্য সীমাহীন দুর্ভাগ্যের কারণ। অতএব প্রতিটি বান্দাকে সর্বদা এ দু'আ করা উচিত যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমৃত্যু গোমরাহী থেকে বাঁচিয়ে হেদায়াতের ওপর অটল-অবিচল রাখো। আমীন!

উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাহ্যত যদিও লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো বান্দাকে সরাসরি হেদায়াত দান ও গোমরাহ করেন, কিন্তু বাস্তবত তার পেছনে বান্দাহর নিকট জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। অতএব উপরোক্ত হেদায়াত ও গোমরাহী উভয়ের বেলায়ই বান্দার মনের কোনো প্রকারের ভূমিকাকে অস্বীকার করে তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলাকে দায়ী করার কোনো সুযোগ নেই। বরং উপরোক্ত উভয় ক্ষেত্রেরই দায়-দায়িত্ব দুনিয়া ও আখেরাতে সম্পূর্ণরূপে বান্দার ওপরই বর্তাবে।

বান্দার জীবনের সুখ-দুখ

বান্দার জীবনের সুখ-দুখ তাকদীরেরই অংশ, যা আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ. (القمر : ٥٣)

"আর ছোট-বড় প্রতিটি কথাই লেখা আছে।" (আল-কামার : ৫৩)

ভালো-মন্দ, সুখ-দুখ ইত্যাদি তাকদীরের ওপর শুধুমাত্র ঈমান পোষণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার ওপর পরিপূর্ণভাবে রাযী ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকাও ঈমানের অংশ। মনে এ ধারণা ও বিশ্বাস মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও কাজ সম্পূর্ণ আদ্ল ও ইনসাফপূর্ণ। তাঁর ইনসাফের ব্যাপারে মনে বিন্দু পরিমাণ সংশয় ও প্রশ্ন সৃষ্টি হলে তা ঈমান, আমল ও আখেরাতকে বরবাদ করে দেবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. (الكهف : ٤٩)

(হে রাসূল!) "আপনার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না।" (আল-কাহ্ফ : ৪৯)

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. (النساء : ٤٠)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বিন্দু পরিমাণ যুলুমও করেন না।" (আন-নিসা : ৪০)

وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيْدِ. (حم السجدة : ٤٦)

(হে রাসূল!) "আপনার রব বান্দাদের উপর যুলুম করেন না।" (হামীম আস-সাজ্দা : ৪৬)

মানুষের জ্ঞান ও যোগ্যতা সীমিত। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তো দূরের কথা, তার নিজের ক্ষুদ্র জীবনের সামগ্রিক অবস্থার বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জ্ঞান ও যোগ্যতাও তার নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা তার জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তাকে দান করেছেন সঠিক, পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

আল্লাহর সৃষ্ট মহাজগতের মাঝে সৌরজগৎ, আসমান, কুরসী ও আরশের বিশালত্বের তুলনায় এ পৃথিবী নামক গ্রহটি বিশাল মরুভূমির মাঝে একটি বালুকণার চাইতেও ক্ষুদ্র। সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বিশাল বিশাল সৃষ্টিকে আবহমানকাল ধরে সুষ্ঠু ও সুনিপুণভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছেন। আর বিন্দুর চাইতেও ক্ষুদ্র পৃথিবীতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ সৃষ্টির মাঝে মানুষ নামক এ সৃষ্টি জীবকে ইনসাফের সাথে পরিচালনা করতে তিনি সামান্যতমও ক্লান্তি ও কষ্ট অনুভব করবেন– এ কথা কি কল্পনা করা যায়? বরং ছোট-বড়, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সকল কিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ইনসাফের সাথেই বান্দার জীবনে সুখ-দুখ নাযিল করেন। কিন্তু সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষ তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই কখনো কখনো কেউ কেউ আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্ত ও কাজের ব্যাপারে বলে ফেলে, "আল্লাহ্ কেন এমনটি করলেন?"

আল্লাহ এমন এক সত্তা যাঁর ওপর মনে বিন্দু পরিমাণ রাগ, অভিমান, ক্ষোভ, বিরক্তি, আপত্তি, প্রশ্ন, দ্বিধা ও সংশয় পোষণ করা যাবে না। বরং তাঁর ওপর পরিপূর্ণ তুষ্ট, রাযী, স্বতঃস্ফূর্ত, নিবেদিত, সমর্পিত ও আকৃষ্ট থাকতে হবে। তাঁর কোনো কাজের যৌক্তিকতা বুঝে আসুক আর না-ই আসুক সে ব্যাপারে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানের অধিকারী ও পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণ হবার কারণে তিনি নিজেই ইরশাদ করেন :

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ. (الأنبياء : ٢٣)

"তিনি যা কিছু করেন তার জন্য তাঁকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না, বরং বান্দাদেরকেই (তাদের কাজের জন্য তাদের রবের নিকট) জবাবদিহি করতে হবে।" (আল-আম্বিয়া : ২৩)

তবে কুরআন ও হাদীসে বান্দার জীবনে সুখ-দুখের কিছু কারণ ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যা আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। নিম্নে কুরআন ও হাদীস থেকে সুখ-দুখের কিছু বিবরণ ও তার ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।

১. বান্দারা যদি ঈমান থাকা অবস্থায় আল্লাহর দেয়া হেদায়াতের আলোকে নেক আমল করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরিচ্ছন্নভাবে জীবন যাপন করার তাওফীক দান করেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. (النحل : ٩٧)

"পুরুষ হোক আর মহিলা হোক, যেই ঈমানের সাথে নেক আমল করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাবো।" (আন-নাহ্ল : ৯৭)

যারা তাওবা ও ইস্তেগফার করে আল্লাহ তাদের ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে দেন।

হূদ (আ) তাঁর জাতিকে লক্ষ্য করে যে কথা বলেছিলেন তা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ. (هود : ٥٢)

"হে আমার কাওম! তোমাদের রবের কাছে ইস্তেগফার করো। তারপর তাঁর নিকট তাওবা করো। তাহলে তিনি আসমান থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির ওপর শক্তি বৃদ্ধি করে দেবেন। আর অপরাধী হয়ে (দাসত্ব করা থেকে) মুখ ফিরিয়ে রেখো না।" (হূদ : ৫২)

আল্লাহ ইস্তেগফার ও তাওবাকারীদের সুখ ও সমৃদ্ধি দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন :

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهُ. (هود : ٣)

"আর তোমরা তোমাদের রবের নিকট মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো। তাহলে এক বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে ভালো জীবিকা দান করবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য প্রত্যেককে তিনি অনুগ্রহ দান করবেন।" (হূদ : ৩)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বান্দাদের ঈমান, নেক আমল, তাওবা ও ইস্তেগফারের বিনিময়স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে পবিত্র জীবন দান, তাদের ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ, তাদের শক্তি বৃদ্ধি এবং সুখ ও সমৃদ্ধি দান করার ওয়াদা করেছেন।

২. পক্ষান্তরে মুসলিম-অমুসলিম পাপিষ্ঠ, গুনাহগার ও সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ-সুবিধা দান করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا. (آل عمران : ١٤٥)

"আর যে দুনিয়ার প্রতিদান চায় আমি তাকে তা দিয়ে দেই।" (আলে ইমরান : ১৪৫)

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ. (الشورى : ٢٠)

"আর যে দুনিয়ার ফসল ও উৎপাদন চায় আমি তাকে তা থেকে কিছু দিয়ে দেই। তবে আখেরাতে তার জন্য কোনো অংশ নেই।" (আশ-শূরা : ২০)

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ. (لقمان : ٢٤)

"আমি অল্প সময়ের জন্য তাদেরকে দুনিয়াতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার সুযোগ দেবো। তারপর তাদেরকে অসহায় অবস্থায় কঠিন আযাবের দিকে টেনে নিয়ে যাবো।" (সূরা লুকমান : ২৪)

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. (آل عمران : ١٩٧)

এটা হলো কয়েকদিনের জীবনের সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য। তারপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, যা বড়ই খারাপ জায়গা।" (আলে-ইমরান : ১৯৭)

গুনাহগার ও সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত উপরোক্ত সুখ-শান্তি তাদের জন্য পুরস্কার ও সুসংবাদ নয়, বরং পরিণামের দিক থেকে তা তাদের জন্য শাস্তি ও দুঃসংবাদস্বরূপ। গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের বৈষয়িক প্রতিদান ও পরিণামস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে এ সুখ প্রদান করেন। অতএব এ সুখ তাদের জন্য নিয়ামত নয়, বরং তা তাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য ও ধ্বংস। যেহেতু দুনিয়ার জীবনে এ সুখ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য আখেরাতের শাস্তিকে অবধারিত ও পরিপূর্ণতা দান করেন। নাউযুবিল্লাহ!

৩. আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো ঈমানদার ও তাঁর অনুগত বান্দাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ নাযিল করে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ. الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ. (البقرة : ١٥٥-١٥٧)

"আমি অবশ্যই ভয়-বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি, ফল ও ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবো। এসব অবস্থায় যারা সবর করে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও, যারা বিপদে পড়লে বলে যে, আমরা আল্লাহরই এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবো। এদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (আল-বাকারা : ১৫৫-১৫৭)

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَّصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ." (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন : "মুসলিম বান্দার যে কোনো ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমনকি কোনো কাঁটা বিঁধলেও তার কারণে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ." (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন।" (বুখারী)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِىَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عَظِمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظِمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَاءُ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ." (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতেই তার ওপর বিপদ-আপদ নাযিল করেন। আর তিনি যখন তাঁর বান্দার প্রতি অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে গুনাহের মধ্যে ছেড়ে দেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তার গুনাহের পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করবেন।" নবী (সা) আরো বলেছেন : "বিপদ আপদের পরিমাণ যত বিরাট হবে প্রতিদান ও পুরস্কারের পরিমাণও ততো বিরাট হবে। আর আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" (তিরমিযী)

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "মুমিন নর-নারীর জান-মাল ও সন্তানের ওপর বিপদ আপদ আসতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় যে, তার আর কোনো গুনাহ থাকে না"। (তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ : "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ." (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) নবীগণের মধ্য থেকে একজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। তখন আমি যেন তাঁর বর্ণনার বাস্তব নযীর স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে তাকাচ্ছিলাম; (তিনি বলেন যে,) একজন নবীকে তাঁর কাওমের লোকেরা মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন : "হে আল্লাহ! আমার কাওমকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : وَالْكَرْبَ أَبَتَاهُ! فَقَالَ لَيْسَ عَلٰى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ إِلٰى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابُ؟ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খুব বেশি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন তখন রোগ যাতনা তাঁকে অজ্ঞান করতে লাগলো। এতে ফাতিমা (রা) বললেন : আহ্ আমার 'আব্বার' কি কষ্ট হচ্ছে! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : 'আজকের দিনের পর তোমার আব্বার আর কষ্ট হবে না।" যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন তখন ফাতিমা (রা) বললেন : হায়! আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে

আব্বা চলে গেলেন! হে আব্বা! জান্নাতুল ফিরদাউস আপনার বাসস্থান! হায়! জিবরীলকে আপনার ইন্তেকালের খবর দিচ্ছি। তাঁর দাফন শেষ হলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর মাটি নিক্ষেপ করতে তোমাদের মন চাইলো? (বুখারী)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে মুমিন ও নেককার বান্দাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট নাযিল হওয়ার কিছু অবস্থা ও বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়েছে যে,

ক. আল্লাহ তা'আলা গুনাহ ক্ষমা করে আখেরাতের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে মুমিনদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট নাযিল করেন।

খ. আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি ও জান্নাতের অবস্থানকে উন্নততর করার উদ্দেশ্যে মুমিন বান্দাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট নাযিল করেন।

গ. পৃথিবীর মানুষদের শিক্ষাদান ও আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও স্থান দান করার উদ্দেশ্যে বিশেষ বান্দাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট নাযিল করেন।

উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা সাধারণভাবে সকল মুমিন ও নেককার বান্দাদের জন্য প্রযোজ্য, আর তৃতীয় অবস্থাটি শুধুমাত্র নবী-রাসূলগণের সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু নবী-রাসূলগণ ছাড়া সকল মুমিনের জীবনে কম-বেশি যে কোনো গুনাহ থাকতে পারে। তাই তাদের জীবনে নাযিলকৃত দুঃখ-কষ্টের কারণ হিসেবে তাদের মানবিক দুর্বলতা ও ক্রটি-বিচ্যুতিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু নবী-রাসূলগণ সকল গুনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। অতএব তাঁদের জীবনের দুঃখ-কষ্টের জন্য তাঁদের কোনো গুনাহকে দায়ী করার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যেই শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর বিপদ-মুসীবত নাযিল করেন।

ঘ. আল্লাহর দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মুমিন ও নবী-রাসূলগণের ওপর যেসব বিপদ-মুসীবত নাযিল হয় তা তাদের গুনাহ ও ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য নয়, বরং তা তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের ওপর বিশেষ করুণা, রহমত ও সৌভাগ্য। যেহেতু আল্লাহর দ্বীনের জন্য বান্দা সন্তুষ্টচিত্তে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে আল্লাহ তা'আলা তার ঐ ত্যাগ ও কষ্টের সওয়াবকে কিয়ামত পর্যন্ত ফসলের মতো উৎপাদন করে বৃদ্ধি করতে থাকেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি যখন বান্দাকে ঐ সকল সওয়াব প্রদান করবেন তখন বান্দা তা পেয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত ও উপকৃত হবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা বান্দার পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কারণে কখনো তার ওপর বিপদ-মুসীবত নাযিল করেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ. (الشورى : ٣٠)

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।" (আশ-শূরা : ৩০)

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. (السجدة : ٢١)

(আখেরাতে) বড় শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়ায়) ছোট শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো। যাতে তারা (তাদের বিদ্রোহী নীতি থেকে) ফিরে আসে।" (আসসাজ্‌দা : ২১)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। মুসলিম গুনাহগারদের মৌলিকভাবে তিনটি অবস্থা হতে পারে।

এক. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর মন পরিপূর্ণভাবে তুষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে তা মেনে চলার ব্যাপারে তার আগ্রহ ও চেষ্টা আছে। এ প্রকৃতির গুনাহগার মুসলিমের জীবনে আল্লাহ তা'আলা যেসব বিপদ-মুসীবত নাযিল করেন তা তার গুনাহের কাফ্‌ফারা (মোচনকারী) হবে এবং আখেরাতে সে তজ্জন্য উপকৃত হবে। এ প্রকৃতির মুসলিমদের আলোচনা ইতোপূর্বে করা হয়েছে।

দুই. ইসলামী জীবন বিধানের ওপর পরিপূর্ণভাবে ঈমান পোষণ করে এবং বিশ্বাস, ধারণা ও চেতনার ব্যাপারে কোনো ত্রুটি ও সমস্যা নেই। তবে বাস্তব জীবনে তা মেনে চলার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ, আগ্রহ ও চেষ্টা কিছুই নেই। এমনকি ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি কোনো অনীহা ও বিদ্বেষ পোষণ করা ছাড়াই নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে কবীরা গুনাহ করে যায়। এ প্রকৃতির মুসলিমকে কুরআন ও হাদীসে ফাসিক বলা হয়েছে। ফাসিক অর্থ মহাপাপী। এদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা খুবই অসন্তুষ্ট। এদের ওপর নাযিলকৃত শাস্তি তাদের পাপাচারের

কাফ্ফারা হবে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে আখেরাতে উক্ত শাস্তিকে তাদের গুনাহের আংশিক কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হিসেবে কবুল করবেন। নতুবা দুনিয়ায় আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের শাস্তির কোনো প্রতিদান ও বিনিময়ই দান করবেন না। বরং আখেরাতে তাদেরকে পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করবেন।

তিন. ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি আছে এবং বাস্তব জীবনে এর কিছু কিছু বিধান পালনও করে। তবে এর অনেক বিধানের প্রতিই মনে অনীহা ও বিদ্বেষ আছে। এমনকি মৌখিকভাবে ও বাস্তব কাজের মাধ্যমে তার বিরোধিতাও করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এদেরকে মুনাফিক ও কাফির বলেছেন। মৌখিকভাবে মুসলিম দাবি করে আন্তরিকভাবে ইসলামের অনেক বিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে তারা মুনাফিক। আর মৌখিকভাবে মুসলিম দাবি করে বাস্তবে ইসলামের অনেক বিধানের বিরোধিতা করার কারণে তারা কাফির। দুনিয়ার জীবনে এদের ওপর নাযিলকৃত শাস্তি আল্লাহর লা'নতস্বরূপ। এদের সাথে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে কাফিরদের মতোই ব্যবহার করবেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. (المائدة : ٣٣)

"এটা তো হলো তাদের জন্য দুনিয়ার অপমান। আর তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে মহাশাস্তি।" (আল-মায়েদা : ৩৩)

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ، وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ. (البقرة : ٨٥)

"তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশের ওপর ঈমান রাখো আর বাকি অংশকে অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ করবে তাদের জন্য এ ছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিন আযাবের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর তোমরা যা কিছু করছো, সে বিষয়ে আল্লাহ বেখবর নন।" (আল-বাকারা : ৮৫)

যাদের পাপাচারের কারণে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের ওপর আযাব ও গযব নাযিল করেন তাদের আরেকটি দল হলো স্বঘোষিত কাফির। এদের ওপর দুনিয়ায় যত রকমের শাস্তিই নাযিল হোক না কেন আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর কোনো বিনিময় ও ক্ষতিপূরণই প্রদান করেবন না। বরং ইসলামী জীবন বিধানকে অস্বীকার করার কারণে তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামেই বসবাস করবে।

৫. আল্লাহ তা'আলা মাঝে মাঝে কোনো এলাকা ও জনগোষ্ঠীর ওপর সাধারণভাবে আযাব ও গযব নাযিল করেন, যাতে দোষী ও নির্দোষী সবাই আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে সকল মানুষকে তাঁর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেন এবং তাদেরকে পাপাচার থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেন। যারা পাপ কাজে লিপ্ত তাদেরকে বাধা দান এবং ভালো কাজের দিকে আহ্বান করার জন্য অবশিষ্ট লোকদেরকে আদেশ করেন। যদি পাপ কাজে লিপ্ত লোকেরা বিরত না হয় অথবা অবশিষ্ট লোকেরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দানের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে সকলের ওপর আযাব ও গযব নাযিল করার কথা ঘোষণা করেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. (الأنفال : ٢٥)

"তোমরা ঐ ফিতনা (আযাব ও গযব) থেকে বেঁচে থাকো, যা শুধু তোমাদের মাঝের যালিমদের ওপরই পতিত হবে না। আর জেনে রাখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তি দানকারী।" (আল-আনফাল : ২৫)

আল্লাহর আহ্বানে সাড়া না দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে তাঁর বান্দাদেরকে শাস্তি দান ও ধ্বংস সাধন করেন। অতীতের জাতিসমূহকে ধ্বংস করার কথা বর্ণনা করে তিনি ইরশাদ করেন :

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ. (العنكبوت : ٤٠)

তাদের মধ্যে কারোর ওপর পাথর বর্ষণকারী তুফান পাঠিয়েছি এবং কাউকে এক বিকট শব্দ আঘাত হেনেছে। আর কাউকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিয়েছি ও কাউকে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তাদের ওপর যুলুম করেননি। কিন্তু তারাই নিজেরা নিজেদের ওপর যুলুম করেছিল।" (আল-আনকাবূত : ৪০)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে সমূলে ধ্বংস করেন না। তবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনপদের ওপর তিনি সাধারণভাবে আযাব ও গযব নাযিল করেন। কখনো কোনো জনপদকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও ঝটিকা দ্বারা ধুলিসাৎ করে দেন। কখনো ভূমিকম্প দ্বারা কোনো জনপদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেন। কখনো কলেরা, বসন্ত ও বিভিন্ন মহামারী দ্বারা এলাকার শত শত লোককে ধ্বংস করে দেন। যাদের পাপাচারের কারণে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আযাব ও গযব নাযিল করেন তারা ছাড়া অসংখ্য সাধারণ নিরীহ লোকজন ও অন্যান্য জীবজন্তু তাতে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও জর্জরিত হয় অথবা মৃত্যুবরণ করে। অথচ এ আযাব ও গযব নাযিল হওয়ার জন্য তারা দায়ী নয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এ নিরীহ লোকজন ও অন্যান্য প্রাণীকূলের কষ্ট ও ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ ও বিনিময় প্রদান দু'ভাবে করেন।

এক. আক্রান্ত মানুষদের মধ্যে যারা মুসলিম তাদের গুনাহ ক্ষমা করে আখেরাতে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

দুই. যাদের পাপের কারণে এ আযাব-গযব নাযিল হয়, নিরীহ লোকজন ও অন্যান্য প্রাণীকূলের কষ্ট ও ধ্বংসের কারণে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে ঐ পাপিষ্ঠদের শাস্তিকে বৃদ্ধি করে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : "إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِيْ فِيْ أُمَّتِيْ عَمَّهُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ" قُلْتُ يَا اَللّٰهُ، أَمَا فِيْهِمْ أُنَاسٌ صَالِحُوْنَ؟ قَالَ "بَلٰى"، قَالَتْ : فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُولٰئِكَ؟ قَالَ "يُصِيْبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، ثُمَّ يَصِيْرُوْنَ إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ".

(رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ)

উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি : "আমার উম্মতের মধ্যে যখন প্রকাশ্যে পাপ কাজ সংগঠিত হতে থাকবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে তাদের ওপর সাধারণভাবে আযাব-গযব নাযিল করবেন।" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের মাঝে কি নেককার বান্দারা নেই? তিনি বলেন : "হ্যাঁ।" উম্মু সালামা (রা) বলেন : তাহলে তারা কি করবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "অন্যান্য মানুষদের সাথে তারাও আক্রান্ত হবে। অতঃপর তারা আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও তার সন্তোষ লাভ করবে।" (ইমাম আহমাদ)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا ظَهَرَ السُّوْءُ فِي الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللّٰهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ بَأْسَهُ" قَالَتْ : وَفِيهِمْ أَهْلُ طَاعَةِ اللّٰهِ؟ قَالَ : "نَعَمْ، ثُمَّ يَصِيرُوْنَ إِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ." (رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন : "জমিনে যখন প্রকাশ্যে পাপ কাজ সংঘটিত হতে থাকবে তখন আল্লাহ তা'আলা জমিনবাসীর ওপর তাঁর শাস্তি নাযিল করবেন।" আয়েশা (রা) বলেন : তাদের মাঝে কি আল্লাহর অনুগত বান্দারাও থাকবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "হ্যাঁ।" তারপর তারা আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে।" (ইমাম আহমাদ)

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার বান্দার জীবনে যে কোনো ধরনের সুখ-দুখ নাযিল করার সুনির্দিষ্ট কারণ ও যৌক্তিকতা আছে। উপরোল্লিখিত অবস্থা ও কারণসমূহ ছাড়াও সুখ-দুখ নাযিল করার আরো অনেক অবস্থা ও কারণ থাকতে পারে, যা সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহই ভালোভাবে জানেন।

মোদ্দাকথা হলো, আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্ত ও হুকুমের কারণ ও যৌক্তিকতা বুঝে আসুক আর না-ই আসুক সে ব্যাপারে মনে এক বিন্দু পরিমাণ আপত্তি ও অসন্তুষ্টি পোষণ করা যাবে না। বরং প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় মনকে তাঁর নিকট নিবেদিত ও সমর্পিত করে দিতে হবে।

মনের প্রকৃতি

যে জিনিস যত বেশি সন্তরণমান ও পরিবর্তনশীল সে জিনিস অন্য কিছু দ্বারা ততো বেশি প্রভাবিত হয়। মন সবচেয়ে বেশি ও দ্রুত পরিবর্তনশীল হবার কারণে তা সবচেয়ে বেশি ও দ্রুত প্রভাবিত হয়। জগতের সাথে জীবনের যত রকমের সম্পর্ক হতে পারে তার ভিত্তিতে শত শত ভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে মন প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন সুখ-দুখ, হাসি-কান্না, ভালোবাসা-ঘৃণা, কোমলতা-কাঠিন্যতা, দয়া-সহানুভূতি, আবেগ-উচ্ছ্বাস, বিনয়-অহঙ্কার, উদারতা-হিংসা, সাহস-ভয় ইত্যাদি সবই মনের স্বভাব ও প্রকৃতির অংশ। এ প্রভাব ও স্বভাবের ক্ষেত্রে মন ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিধান, গণ্ডি ও সীমা মেনে চলে না। যেহেতু এ ক্ষেত্রে সৃষ্টিগতভাবে তা উন্মুক্ত ও নিয়ন্ত্রণহীন, পরবর্তীতে যেভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা হয় সেভাবেই তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। অতএব যে কোনো ভালো, কল্যাণকর ও উন্নত বিষয়ে যেমন মনে আগ্রহ, আবেগ, আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা সৃষ্টি হতে পারে তেমন মন্দ অহেতুক ক্ষতিকর, তুচ্ছ ও গর্হিত কোনো বিষয়ের প্রতিও তা সৃষ্টি হতে পারে।

যে কোনো বিষয়ে আবেগ, ঐকান্তিকতা ও তজ্জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা থাকাই তা সঠিক, সত্য ও কল্যাণকর হবার প্রমাণ নয়। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার সাথে নিয়ন্ত্রিত আবেগ পোষণ উন্নতি ও কল্যাণের জোয়ার বইয়ে দেয়। আর ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি অথবা মূর্খতার সাথে আবেগ পোষণ দুনিয়া-আখেরাতের প্রভূত ক্ষতি ও অকল্যাণ সাধন করে। সঠিক, সত্য ও কল্যাণের মানদণ্ড উল্লেখ করার পূর্বে আমি সাধারণভাবে আবেগ, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার কিছু বাস্তব উদাহরণ পেশ করছি।

১. বর্তমান যুগে বিশ্বময় বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলা সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোকদের মনে আলোড়ন ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। উক্ত খেলাদ্বয় দেখা ও উপভোগ করার জন্য বিশ্বময় স্টেডিয়ামগুলোতে যত অধিক সংখ্যক লোকের উপস্থিতি ও সমাগম লক্ষ্য করা যায় তেমন আর অন্য কোনো কিছুতে লক্ষ্য করা যায় না। সমস্ত দর্শক সাধারণভাবে তিনভাগে বিভক্ত।

(এক) নিরপেক্ষ। এরা নির্দিষ্ট কোনো পক্ষেরই সমর্থক নয়। বরং শুধুমাত্র খেলা উপভোগ করার জন্যই এরা উপস্থিত হয়। যে কোনো পক্ষের হার-জিতে এদের মনে আনন্দ-বেদনার উদ্রেক হয় না এবং তেমন আবেগাপ্লুত হয় না।

(দুই) কোনো এক পক্ষের সমর্থক।

(তিন) দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থক।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর দর্শকরা নিজ নিজ পক্ষ ও দলের হার-জিতে আনন্দিত ও বেদনাহত হয়। এমনকি নিজ দলের বিজয়ে অধিক আনন্দ ও আবেগের চোটে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার ঘটনাও ঘটেছে। পক্ষান্তরে নিজ দলের পরাজয়ে অত্যধিক বেদনা সইতে না পেরে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার ঘটনাও ঘটেছে। এ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি[১] ও নিজ দলের হার-জিতে আনন্দ-বেদনায় মূর্ছে পড়া লক্ষ লক্ষ দর্শকদের– খেলা ও খেলোয়াড়দের প্রতি এ সীমাহীন আন্তরিকতা, আবেগ ও ঐকান্তিকতার কারণ, ব্যাখ্যা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তাহলে তারা এর কোনো ব্যাখ্যা ও সদুত্তর দিতে পারবে না। যেহেতু এ আবেগ ও ভালোবাসার পেছনে তাদের কোনো স্বার্থ, উদ্দেশ্য, উপকারিতা, সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন কিছুই নেই। এমনকি যে খেলোয়াড়দের জন্য তাদের মনগুলো উজাড় ও উৎসর্গ ঐ খেলোয়াড়রা তাদের অধিকাংশকেই চেনে না। কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অনেক সমর্থককে মারাত্মকভাবে আহতকারী এ পাগলপারা ভক্ত ও অনুরক্তদের খেলোয়াড়রা বৈষয়িক কোনো উপকার সাধন করা তো দূরের কথা, বরং তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে একটুখানি শুকরিয়া জানানোর সুযোগও তাদের হয় না। অতএব এটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ও নিঃস্বার্থ একটি উচ্ছ্বাস। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলাকে হারাম বলা এবং তজ্জন্য আন্তরিকতা, আবেগ ও নিষ্ঠা পোষণ করাকে পাপ ও অন্যায় বলা বা তাকে তুচ্ছ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং মনের প্রকৃতির বিশ্লেষণ করাই শুধু আমার উদ্দেশ্য।

২. একজন ব্যক্তি আজীবন গান-বাজনা শুনা ও চর্চা করার কারণে গান-বাজনার প্রতি তার মনে গভীর আবেগ, আন্তরিকতা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। গান-বাজনা শুনে ও চর্চা করে সে এতো তৃপ্তি উপভোগ করে যে, তা তাকে বিমোহিত ও মদমত্ত করে তোলে। কখনো আবেগাপ্লুত হয়ে সে ক্রন্দনও করে। গান-বাজনার আয়োজন, প্রচলন, প্রতিষ্ঠা, তার উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জন্য সে যে কোনো ধরনের কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সহ্য করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফের সাথে কোনো প্রকারের সম্পর্ক না থাকার কারণে তার সর্বোন্নত সুরের তিলাওয়াত শুনেও তার মনে বিন্দুমাত্র তৃপ্তি ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। বরং

টীকা-১ ঃ যদি তাকে প্রশ্ন করা সম্ভব হতো।

এর শব্দ তার কানে জ্বালা সৃষ্টি করে আর তার মনে সৃষ্টি করে বিরক্তি। নাউযুবিল্লাহ।

বিপরীত দিকে আরেকজন ব্যক্তি জীবনের শুরু থেকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, শ্রবণ ও চর্চা করার কারণে এর প্রতি তার মনে আন্তরিকতা, আবেগ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এর তিলাওয়াত তার মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও আলোড়িত করে এবং এর প্রবল আকর্ষণে সে অকপটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রন্দন করে পরম তৃপ্তি উপভোগ করে। পক্ষান্তরে গান-বাজনার সাথে তার সম্পর্ক না থাকার কারণে তা তার মনে বিন্দুমাত্র প্রভাব ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে না। বরং গান-বাজনার শব্দ তার কানে জ্বালা ও মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে।

৩. এক ব্যক্তি একটি কুকুর পালে। ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি প্রায় সর্বাবস্থায় কুকুরটি তার পাশেই থাকে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো কুকুরটিও একজন সদস্যের মর্যাদা নিয়ে তার সাথে বসবাস করে। অধিক আদর-যত্ন পাওয়ার কারণে সে যেমন অকৃত্রিমভাবে লোকটিকে ভালোবাসে তেমন লোকটিও তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। কুকুরের অসুস্থতায় লোকটি খুবই অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়। হঠাৎ একদিন কুকুরটি মৃত্যুবরণ করলে সে তার জন্য গভীরভাবে শোকাহত হয়ে ক্রন্দন করে।

পক্ষান্তরে পাশের বাড়িতেই বসবাস করে একজন ভদ্রলোক, যে অত্যন্ত সৎ, মহৎ ও পরোপকারী। তার সাথে এ লোকটির স্বাভাবিক প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বিরাজমান। হঠাৎ একদিন লোকটি ঐ সৎ ও মহৎ লোকটির মৃত্যু সংবাদ শুনতে পেয়ে তাকে দেখতে যায়। আপনজনদের বুকফাটা কান্নার দৃশ্য দেখে এ লোকটি তাদের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মৌখিকভাবে সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করে। অথচ মৃত প্রতিবেশীটির জন্য তার মনে কোনো আবেগ, অস্থিরতা, শোক ও কান্না কিছুরই উদ্রেক হয়নি।

৪. আমাদের নিজেদের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব থেকে শুরু করে সৃষ্টিজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার নিদর্শনাবলী। প্রতিটি বস্তুই প্রতিটি বিবেকবান মানুষের অনুভূতিকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে তাকে প্রতিনিয়ত আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের দিকে ডেকে যাচ্ছে। আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, মহাসমুদ্র, বন-বনানী, তরুলতা, সমস্ত প্রাণীজগৎ, মানুষের হাত, পা, নাক, কান, চক্ষু, হৃৎপিণ্ড তথা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবকিছুই আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতার চাক্ষুস প্রমাণ ও সাক্ষী। এতসব বিস্ময়কর প্রমাণাদির মধ্যে ডুবে থাকা

সত্ত্বেও এমন কোটি কোটি আল্লাহর বান্দা আছে যারা কখনো এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করে না। আল্লাহর সীমাহীন কুদরতের এসব বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী তাদের মনে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কখনো সামান্যতম আবেগ, অভিভূতি, আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সৃষ্টি করে না। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ. (يوسف : ١٠٥)

"আসমান-জমিনে কতই না নিদর্শন রয়েছে, যার ওপর দিয়ে এরা যাতায়াত করতে থাকে। অথচ সেদিকে তারা একটুও লক্ষ্য করে না।" (ইউসুফ : ১০৫)

পক্ষান্তরে আল্লাহর এমন কোটি কোটি বান্দা আছে যারা প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সীমাহীন কুদরতের প্রমাণ ও নিদর্শন দেখতে পায়। তারা প্রতিটি বস্তু দেখেই অভিভূত ও আবেগাপ্লুত হয়। তাদের মনে সৃষ্টি হয় আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা, আবেগ, ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা। আর নিবেদিত ও আত্মনিবিষ্ট হয় তারা আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ. (السجدة : ١٥)

"যখন তাদেরকে আমার আয়াত (নিদর্শনাবলীর কথা) শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ্ করে। আর তারা অহঙ্কার করে না।" (সাজদাহ্ : ১৫)

وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا. (بنى إسرائيل : ١٠٩)

"আর তারা মুখ নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে (সাদজায়) লুটিয়ে পড়ে এবং (আল্লাহর আয়াত দেখে ও শুনে তাঁর প্রতি) তাদের বিনয়, অনুরাগ ও ভালোবাসা আরো বেড়ে যায়।" (বানী ইসরাঈল : ১০৯)

৫. একজন ধার্মিক হিন্দু ও খ্রিস্টান বুঝ-জ্ঞান হওয়ার পর থেকে হিন্দু ও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা, চর্চা ও অনুশীলন করতে থাকে। উভয়েই নিজ নিজ উপাসনালয় মন্দির ও গীর্জায় স্ব স্ব ধর্মসম্মত পন্থায় গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে উপাসনা করে। এমনকি শির্কমিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও উপাসনার সময় আল্লাহর ভালোবাসায় তারা

প্রায়ই ক্রন্দন করে। তাদের ইবাদতের এ পদ্ধতি আল্লাহ প্রদত্ত নয়। বরং তারা নিজেরাই যে এ পদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছে তা তারা স্বীকার করে। পক্ষান্তরে এ ব্যক্তিদ্বয় কখনো ইসলামের শিক্ষা, চর্চা ও অনুশীলন না করার কারণে ইসলামের ইবাদত যেমন নামায, রোযা, হাজ্জ ইত্যাদির প্রতি কোনো আবেগ, আন্তরিকতা ও আকর্ষণ অনুভব করে না।

বিপরীত দিকে একজন ব্যক্তি বুঝ-জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ইসলামের শিক্ষা, চর্চা ও অনুশীলন করতে থাকে। অত্যন্ত আবেগ ও আন্তরিকতা সহকারে সে ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহ পালন করে। এ ছাড়া জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়েই এর প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-বিধান দেখে সে অভিভূত হয়ে যায়। অতঃপর সে দেখতে পায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাতলানো পদ্ধতিতে কৃত জীবনের প্রতিটি কাজকেই আল্লাহর ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং তজ্জন্য আখিরাতে পুরস্কারস্বরূপ তাকে জান্নাত দান করার ওয়াদা করেছেন। তখন সে অত্যন্ত আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে পরম নিষ্ঠার সাথে ইসলামের প্রতিটি বিধান পালন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করে। এর জন্য যে কোনো ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করার মধ্যে সে তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করে।

৬. একজন মহিলার গর্ভধারণের পর থেকেই তার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক বিরাট প্রভাব ও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিছুদিন পর নিজের সন্তানের মুখ দেখে ও তাকে বুকে ধারণ করে আদর করার পরম আশা ও আনন্দের পাশাপাশি শুরু হয়ে যায় তার ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের সংগ্রাম ও অভিযান। গর্ভে সন্তানের দেহ গঠনের পর্ব সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ তিন/চার মাস একাধারে খাবার-পানীয় উদগীরণ করার কষ্ট সে নীরবে সহ্য করে। তারপর সন্তান প্রসবের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় চার/পাঁচ মাস গর্ভস্থিত সন্তানের ভার বহনের কষ্ট সহ্য করে। অতঃপর সন্তান প্রসবকালীন যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় তা একমাত্র ভুক্তভোগী মা-ই বলতে পারে। সন্তানকে বুকের সাথে লাগিয়ে কোলে ধারণ করার পর আল্লাহ তা'আলা মায়ের ইতোপূর্বেকার সকল দুঃখ-কষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তিতে রূপান্তরিত করে দেন। কিন্তু কষ্টের পালা এখানেই শেষ নয়। এরপর শুরু হয় তাকে লালন-পালন করে বড় করার এক দীর্ঘ সংগ্রাম ও অভিযান। একজন সন্তান স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-Sufficient) হওয়া পর্যন্ত এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় মা দুঃখ-বেদনা, রোগ-শোক, দুর্ঘটনা, রাতের পর রাত বিনিদ্রযাপন, উদ্বিগ্নতা, অস্থিরতা, হাসি-কান্নাসহ আরো যত শত শত ঘটনা ও পরিস্থিতির মুকাবিলা করে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তা কাগজে লিখলে বিরাট বিরাট ভলিয়ম তৈরি হবে। আর

সি.ডি তে রেকর্ড করলে হাজার হাজার ঘণ্টা তা উপভোগ করা যাবে। এতো কষ্ট-সাধনার ফসল এ সন্তানের প্রতি মায়ের মনে যে কি পরিমাণ মায়া, আদর ও আবেগ সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা করে বুঝাবার ভাষা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেননি। এটা শুধুমাত্র মন দিয়ে অনুভব ও উপলব্ধিই করা যায়।

পক্ষান্তরে ঐ মহিলার কোলে তুলে দেয়া হয় তার প্রতিবেশীর এক সন্তানকে। এবার বলুন, প্রতিবেশীর সন্তানের প্রতি কি এ মহিলা তার নিজের সন্তানের মতো আদর অনুভব করবে? অবশ্যই নয়। বরং এই দুই সন্তানের মাঝে আদরের পার্থক্য আসমান-জমিনের মাঝের ব্যবধানসম হবে। এর কারণ কি? এর দুইটি কারণ আছে।

এক. প্রতিবেশীর সন্তানের সাথে তার নিজের সন্তানের মতো ত্যাগ-তিতিক্ষা, দীর্ঘ সংগ্রাম ও শত শত স্মৃতি কিছুই জড়িত নেই।

দুই. তার নিজের গর্ভজাত সন্তান তার দেহ ও রক্ত থেকে সৃষ্ট, যার সম্পর্ক তার নাড়ির সাথে। জৈবিক সম্পর্কের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা মায়ের মনে নিজ সন্তানের প্রতি এক অনাবিল আত্মিক ও প্রাকৃতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। যার কারণে চেতন ও অবচেতনভাবে মা তার সন্তানের প্রতি চরম আকর্ষণ অনুভব করে, যেমনটি অপরের সন্তানের প্রতি কস্মিনকালেও সৃষ্টি হয় না।

মানুষের জীবন থেকে নেয়া উপরোক্ত বাস্তব চিত্র ও ঘটনাসমূহ ছাড়াও জগতে আরো শত শত অবস্থা, ঘটনা ও দৃশ্য আছে যা দ্বারা মানুষের মন প্রভাবিত হয়। প্রতিটি বিষয়ে সঠিক, উপযোগী ও ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড নিরূপণ করার মতো পরিপূর্ণ জ্ঞান মানুষের নেই। বরং তা নিরূপণ করার মতো পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত জ্ঞান আছে ঐ সত্তার যিনি মানুষ ও অন্যান্য সকল কিছুকে সৃষ্টি করে তাদেরকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন। যিনি অসীম ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী। অতএব প্রতিটি বিষয়েই গ্রহণ ও বর্জন, পছন্দ-অপছন্দ, ভালোবাসা-ঘৃণা সব কিছুই করতে হবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেয়া বিধান ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে। এ বিষয়টি উন্মুক্ত ও লাগামহীন মনের ওপর ছেড়ে দেয়া যাবে না। যেহেতু সঠিক, উপযোগী ও চূড়ান্ত কিছু নিরূপণ করার মতো ক্ষমতা মনের নেই। এ স্থলে প্রতিটি মানুষকে তার বিবেককে কাজে লাগিয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার দেয়া স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ বিধান ও মানদণ্ডের আলোকে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদের পূর্বে যত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে

প্রত্যেকটিতে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে। তাঁর আগমনের পর সকলকেই তাঁর ওপর ঈমান আনতে হবে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর নিকট আসা রিসালাত ও হেদায়াতের অনুসরণ করতে হবে। তাঁর আগমনের পর পূর্ববর্তী রাসূলগণের ওপর নাযিলকৃত রিসালাত ও শারী'য়া রহিত (منسوخ) হয়ে গেছে। তা যদি সম্পূর্ণ অবিকৃতও থাকতো তবুও মুহাম্মদ (সা)-এর শারী'য়াকে বাদ দিয়ে কেউ তা পালন করলে সে কাফির হয়ে যেতো। আর পূর্ববর্তী বিকৃত ও পরিবর্তিত শারীয়ার অনুসরণ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তা বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ فَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. (الأعراف : ١٥٨)

(হে রাসূল!) "আপনি বলুন : হে মানব জাতি! আমি তোমাদের জন্য ঐ আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল, যিনি আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মউত ঘটান। তাই ঈমান আনো আল্লাহর উপর ও ঐ উম্মী নবীর প্রতি যিনি তাঁর রাসূল, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীকে মানেন। অতএব তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। আশা করা যায় যে, তোমরা হিদায়াত পাবে।" (আল-আ'রাফ : ১৫৮)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ. (آل عمران : ٣١-٣٢)

(হে রাসূল!) "মানুষকে বলুন : যদি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত করো তাহলে আমার অনুসরণ করো, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। আপনি বলুন : তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। যদি তারা তা

করতে অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।" (আলে-ইমরান : ৩১ ও ৩২)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ مَرَرْتُ بِأَخٍ لِىْ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَتَبَ لِىْ جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَلاَ أَعْرَضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَابِتٍ : قُلْتُ لَهُ : أَلاَ تَرٰى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ : رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً. قَالَ فَسُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ أَصْبَحَ فِيْكُمْ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّىْ مِنَ الْأُمَمِ وَأَنَا حَظُّكُمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ. (رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ)

আরেকটি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

لَوْ كَانَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا إِلاَّ اتِّبَاعِىْ.

"যদি মূসা ও ঈসা (আ) জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা তাঁদের ওপর অপরিহার্য হতো।"

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর সমগ্র পৃথিবীবাসী তাঁর ওপর ঈমান আনা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উপস্থাপিত হিদায়াত ও শারী'য়ার আলোকে জীবনের প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দেয়া ফরয। এ ছাড়া অন্য যে কোনো মত, পথ ও বিধানের অনুসরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই কবুল করবেন না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ. (آل عمران : ٨٥)

"যে ব্যক্তি ইসলাম [মুহাম্মদ (সা)-এর উপস্থাপিত দ্বীন ও হেদায়াত] ছাড়া অন্য কোনো পথ ও বিধান তালাশ করে, তার ঐ পথ ও বিধান অবশ্যই কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে বিফল ও ব্যর্থ হবে।" (আলে-ইমরান : ৮৫)

এ পৃথিবীর সংসারে এমন ঘটনা সংঘটিত হবার নযীরও আছে যে, জন্মের পরই যে কোনো কারণে সন্তান ও মায়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়ে যায়। অতঃপর মা অপরের সন্তান এনে তার বুকে ধারণ করে মনকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করে। আর তার নিজের সন্তান লালিত-পালিত হতে থাকে অপরের কোলে। এভাবে অপরের কোলে তার সন্তানের শিশুকাল অতিবাহিত হয়ে সে পদার্পণ করে বাল্যকালে। অবশেষে কালের পরিক্রমায় হঠাৎ একদিন এ মহিলা তার কলিজার ধন সন্তানের সন্ধান পেয়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় সাত আটটি বছর বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও নিজ সন্তানকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে এ মহিলা তার প্রতি মনে যে পরম আদর, আবেগ, আকর্ষণ ও তৃপ্তি অনুভব করে– দীর্ঘ আটটি বছর ধরে তারই কোলে লালিত অপরের সন্তানের প্রতি সে ঐ পরিমাণ আদর ও আকর্ষণ অনুভব করে না। এর কারণ কী ? এর কারণ হলো, নিজ সন্তানের সম্পর্ক হলো তার দেহ, আত্মা, প্রকৃতি ও অস্তিত্বের সাথে। আর অপরের সন্তানের সম্পর্ক এর কোনোটির সাথেই নয়। অতএব তার প্রতি নিজ সন্তানের মতো আদর ও আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক নয়।

আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান ইসলামের সাথে সম্পর্কের বেলায় কোটি কোটি বনী আদমের জীবনে উপরোক্ত ঘটনার মতো একই অবস্থার অবতারণা চলছে। সমগ্র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জন্য একমাত্র ইসলামকে তাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামই তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির বিধান। ইসলামের সম্পর্ক তাদের দেহ, আত্মা তথা অস্তিত্বের সাথে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا، فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ، ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ. (الروم : ٣٠)

"অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীরা!) একমুখী হয়ে আপনার লক্ষ্যকে এই

দ্বীনের ওপর কায়েম রাখুন। আল্লাহ মানুষকে যে স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছেন তারই ওপর দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহর তৈরি কাঠামো বদলানো যায় না। এটাই পুরোপুরি সঠিক দ্বীন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।" (আররূম : ৩০)

এ আয়াতে আল্লাহর সৃষ্ট স্বভাব বলতে ইসলামকে মেনে চলার যোগ্যতা, প্রতিভা ও প্রকৃতিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিসুলভ, আর ইসলাম ছাড়া অন্য যে কোনো কিছুর অনুসরণ তার স্বভাব ও প্রকৃতি বিরোধী। মানুষ ও সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা মানুষের প্রয়োজন, যোগ্যতা, শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিশীল, উপযোগী ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তাকে এ বিধান ও পথ দান করেছেন। সীমিত ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে এ ধরনের বিধান রচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বরং অসীম জ্ঞানের অধিকারী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষেই শুধুমাত্র এ ধরনের শাশ্বত ও উপযোগী বিধান রচনা করা সম্ভব। একমাত্র এ বিধান মেনে চলার মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের জন্য দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি। এ ছাড়া অন্য কোনো বিধানের অনুসরণ করার মাধ্যমে শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জন করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর দেয়া তাদের স্বভাবসুলভ এ বিধানকে বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরি বিধানের অনুসরণ করে। মানুষ যদি ইসলামী বিধানকে অনুধাবন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা মেনে চলে তাহলে সে তাতে যে শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করবে মানব রচিত বিধানের অনুসরণের মধ্যে তেমন শান্তি ও তৃপ্তি সে কিছুতেই অনুভব করবে না। যেহেতু ইসলামী বিধান তার নিজস্ব, যার সম্পর্ক তার স্বভাব, প্রকৃতি, আত্মা ও অস্তিত্বের সাথে। আর মানব রচিত বিধান তার নিজস্ব নয়। বরং তা শয়তান থেকে উদ্বুদ্ধ ও সৃষ্ট, যার দেহ, মন ও স্বভাব কোনোটির সাথেই সঙ্গতি, মিল ও সাযুজ্য নেই। তা দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোনোই কল্যাণ সাধন করতে পারে না।

মুসলমানদের মধ্যে যারা অবহেলা প্রদর্শন করে ইসলামী বিধান লঙ্ঘন করে, যারা তার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ পোষণ করে তা অমান্য করে, আর মানুষদের মধ্যে যারা এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের সবার নিকট আমার উদাত্ত আহ্বান হলো, আমার উপরোক্ত বক্তব্যের বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য আপনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন :

১. খাঁটি মুসলিমদের ইসলামী বিধানের অনুসরণের ব্যাপারে তাদের তৃপ্তি, অনুভূতি ও মনের অভিব্যক্তি সম্পর্কে জানুন ও শুনুন, যেমনটি মানব রচিত বিধানের

অনুসারীদের মধ্যে আপনারা কস্মিনকালেও লক্ষ্য করবেন না। যেহেতু ইসলামের বিধান হলো সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর রচিত, যা পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল, শাশ্বত ও ভারসাম্যপূর্ণ। অতএব তার অনুসরণের মাঝে যে তৃপ্তি, শান্তি ও কল্যাণ নিহিত আছে তা মানব রচিত ত্রুটিযুক্ত, অপূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যহীন বিধানের অনুসরণের মাঝে পাওয়া অবশ্যই সম্ভব নয়।

২. ইসলামী বিধানের অনুসারীরা ইসলামকে যতই গভীরভাবে অধ্যয়ন করে ইসলামের ব্যাপারে তাদের মধ্যে ততই অটলতা, অবিচলতা, মযবুতি ও একনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। আর মানব রচিত বিধানের অনুসারীরা তাদের বিধানকে যতই গভীরভাবে অধ্যয়ন করে ততোই তার ত্রুটি ও ভারসাম্যহীনতা প্রকট ও স্পষ্টভাবে তাদের সামনে ফুটে ওঠে আর তার প্রতি তাদের মনে দুর্বলতা ও অনাস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. ইসলামী জীবন বিধান পূর্ণাঙ্গ। তা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করে। অমুসলিমদের সাথে ইনসাফপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম করার বিষয়ে এর প্রধান দুই মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে রয়েছে বিস্তারিত বর্ণনা। মুসলিম শাসিত অমুসলিম এলাকায় অমুসলিমদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে প্রচুর। কোনো কারণবশত মুসলিমরা ঐ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার মুহূর্তে অমুসলিমরা তাদেরকে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা এমনকি মুসলমানদের বিচ্ছেদে তাদের ক্রন্দন করার নযীরও ইতিহাসে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে অমুসলিম শাসিত মুসলিম এলাকার মুসলিমরা পরিপূর্ণ সুখি ও সন্তুষ্ট হওয়ার একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাবেন না। বরং প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে অমুসলিম নাগরিকদের দ্বারা মুসলমানরা নিগৃহীত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হওয়া, প্রশাসনের পক্ষ হতে মুসলিমদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার হরণ করা এবং সামগ্রিক দিক থেকে তারা চরম বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হওয়ার শত শত উদাহরণ ও ঘটনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা সমৃদ্ধ পাবেন।

৪. কোনো খাঁটি মুসলিম কখনো ইসলাম ত্যাগ করে অমুসলিম হয় না। আর অমুসলিমদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা সবাই খাঁটি অমুসলিম। অর্থাৎ খাঁটিভাবে তারা মানব রচিত বিধান পালন করতে গিয়ে যখন তার ত্রুটি, গলদ, বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দেখতে পায় তখনই তারা তা ত্যাগ করে সাম্য

ও ইনসাফের বিধান ইসলামকে গ্রহণ করে। অমুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম গ্রহণকারীর হার অনেক বেশি। আর মুসলমানদের মধ্য হতে ইসলাম ত্যাগকারীর সংখ্যা খুবই কম। আর যারা ইসলাম ত্যাগ করে তারা দারিদ্র্য, অত্যাচার, ভয়-ভীতি, প্রলোভন ও স্বার্থের যে কোনোটির শিকার হয়। ইসলাম ত্যাগ করার পর এরা কেউই ইসলামের কোনো দোষ-ত্রুটি ও নিন্দা প্রকাশ করে না।

পক্ষান্তরে অমুসলিমদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা প্রাচুর্যতা, নিরাপত্তা, সুখ ও সুযোগ-সুবিধাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিসর্জন দিয়ে ইসলাম গ্রহণের কারণে দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্যতা, ভয়-ভীতি ও যুলুম-অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। উক্ত সকল প্রকারের বৈপরিত্য ও প্রতিকূলতার মাঝেই তারা তাদের মনে অনুভব ও উপভোগ করে এক পরম স্বর্গীয় তৃপ্তি, আবেগ, আনন্দ ও প্রশান্তি– যা সকল প্রকারের বৈষয়িক ব্যথা-বেদনাকে ম্লান করে দেয়।

এদের উদাহরণ ঐ নিজ সন্তানহারা মায়ের মতো। জীবনের একটি মুহূর্তকাল পর্যন্ত এরা মানব রচিত বিধানকে নিজেদের বিধান মনে করে তার অনুসরণ করে চলছিল, যা প্রকৃতপক্ষে তাদের বিধান নয়। পরিশেষে যখন সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে তাদের মনের বন্ধ-দুয়ার খুলে যায় এবং মনের মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা গোমরাহির আঁধারের বুক চিরে প্রভাতের সোনালী সূর্যের ন্যায় তাতে আল্লাহর দেয়া নিজেদের স্বভাব ও আত্মার বিধান ইসলামের আলো জ্বলে ওঠে তখন তারা চমকিত, পুলকিত ও অভিভূত হয়ে যায়, যেমনিভাবে দীর্ঘদিন পর মা নিজ সন্তানকে পেয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আবেগ ও আনন্দে পাগলপারা হয়ে যায়। এমনটি ইসলাম ত্যাগকারী কোনো ব্যক্তির মধ্যে আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন না।

এ কথার যথার্থতা ও বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য ইসলাম গ্রহণকারী অসংখ্য মানুষের বিস্ময়কর অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত বইসমূহ অধ্যয়ন করুন। তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট ও ঘটনাসমূহ অধ্যয়ন করলে ন্যূনতম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের মনও গভীরভাবে প্রভাবিত ও আন্দোলিত হয়।

আপনি যদি বলেন যে, এটি একটি তাদের নিছক আবেগ মাত্র। তাহলে এর জবাবে আমি বলবো, হ্যাঁ ভাই! যে আবেগের উৎস নিছক ইহজাগতিক কোনো কারণ, সত্তা, নিয়ম ও উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচী নেই, যাতে পূর্ণাঙ্গতা নেই, স্থায়িত্ব নেই, যাতে সুখ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার কোনো

গ্যারান্টি নেই এবং যার কার্যকারিতা ও ফলাফল নশ্বর ও পতনশীল এমন আবেগের তেমন মূল্য নেই। তা হয়ত ক্ষণিকের জন্য আবেগাপ্লুত ব্যক্তির মনে কিছুটা আনন্দ, তৃপ্তি ও প্রেরণা দান করতে পারে। কিন্তু ইসলাম কি তেমন কোনো বস্তু? ইসলামের প্রণেতা তো হচ্ছেন সরাসরি সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা, যাঁর তর্জনী হেলনে পরিচালিত হচ্ছে প্রতিটি বালুকণা থেকে শুরু করে মহা সৌরজগৎ, সপ্ত আসমান ও সর্ববৃহৎ সৃষ্টি আরশ। ইসলামের জ্যোতির আগমন তো ঘটেছে সপ্তাকাশেরও আরো অনেক ওপরে অবস্থিত বিশাল আরশের মালিক অনন্ত, অসীম ও অবিনশ্বর সত্তা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে। যে জ্যোতি অনির্বাণ, শাশ্বত ও চিরন্তন। যার আলোয় উদ্ভাসিত সমগ্র সৃষ্টিজগৎ। যার জন্য সৃষ্ট মানুষসহ সকল কিছু। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের সত্তা ও অস্তিত্বের মাঝে যার বীজ বপন করে তাদের মজ্জা ও স্বভাবগত করে দেয়া হয়েছে তাকে। যার ফলাফল শুধুমাত্র এ নশ্বর পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আখিরাতের অনন্তকালীন জীবনে তার ফলাফল পরিব্যপ্ত। যখন ইসলামের শেষ চিহ্নটুকু মুছে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করে দেবেন। ইসলামের সেই ঐশী ও স্বর্গীয় জ্যোতি কারো মনমাঝে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠার পর সে যে আনন্দ-আবেগ ও তৃপ্তি উপভোগ করে তার সাথে কি সৃষ্টি জগতের অন্য কোনো কিছুর তুলনা করা যায়?!!

মানুষ বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, তাকে মৃত্যুর পর আখিরাতের অনন্তকালীন জীবনে প্রবেশ করতেই হবে এবং তথায় আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও কাজের হিসাব দিতেই হবে। অতএব দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যা কল্যাণকর সে যেন তাই ইখতিয়ার ও মনোনয়ন করে। এর অন্যথা কিছু করলে আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতিই হবে না। বরং তাতে তারই দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধিত হবে।

নিয়ন্ত্রণহীন মনের প্রকৃতি হলো তা সর্বদা সহজ, আরামদায়ক, চাকচিক্যময় ও জাঁকজমকপূর্ণ বিষয় ও বস্তুর দিকে ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়। আর আমরা ইতোপূর্বেই জানতে পেরেছি যে, বাঁধনহীন মনের চাহিদা ও দাবি ভালো-মন্দের মাপকাঠি নয়। বরং ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়েই ভালো-মন্দের চূড়ান্ত মাপকাঠি হলো মুহাম্মদ (সা)-এর পেশকৃত দ্বীন ও হিদায়াতের মানদণ্ড যার অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাঝে আছে কিছুটা কষ্ট, ত্যাগ ও বিসর্জন। মনকে এ মানদণ্ডের ছাঁচে গঠন ও প্রস্তুত করতে হলে ব্যক্তিকে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তা হলো :

১. আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান আল ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা। আর তা এর প্রধান দুই মূলনীতি কুরআন ও হাদীস এবং তার সহায়ক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে অতি সহজেই অর্জন করা সম্ভব।

২. ইসলামী জীবন বিধানের অনুসরণের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করা। আর তা এর অধ্যয়ন ও বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব।

৩. ইসলামী জীবন বিধানের অনুপস্থিতি এবং এর বিপরীত মানব রচিত আইন ও বিধানের ত্রুটি ও ক্ষতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা। আর এ জন্য তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে হবে। এতে এ দুয়ের মাঝের পার্থক্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৪. ইসলামী জীবন বিধানকে জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মানা ও বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করা এবং তজ্জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা।

৫. চেষ্টা-সাধনা ও চর্চায় নিয়মতান্ত্রিকতা ও ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা।

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করার পর মনে ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি পর্যায়ক্রমে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, আগ্রহ, আবেগ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। অতঃপর মন যখন ইসলামী জীবন বিধান পালনে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন তা পালনের কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি হয় পরম তৃপ্তি ও আনন্দ। কারোর মন যখন এ পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন আল্লাহর হুকুম পালন না করে নিষ্ক্রিয় থাকলে তার মনে চরম বেদনা ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এ মনের অধিকারী ব্যক্তি সকল উত্তম ও সৎকাজে পরম তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে। আর সকল অন্যায় ও পাপ কাজে চরম অস্বস্তি ও অস্থিরতা অনুভব করে। মনের এ পর্যায় ও অবস্থাকে আরবিতে 'ইহ্সান' বলা হয়। এটি ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরে পৌছার জন্য ব্যক্তিকে যথেষ্ট শ্রম ও সাধনা করতে হয়।

যারা আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের জন্য তাদের মনকে অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করার এতটুকুন কষ্ট স্বীকার না করে তাকে উদভ্রান্তের মতো চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেয়, মৃত্যুর সময় রূহ কবযের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর কঠিন মৃত্যুযন্ত্রণা সৃষ্টি করেন এবং তাদের সামনে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির বিভীষিকাময় দৃশ্য তুলে ধরেন। তখন সকল পাষাণ, পাপিষ্ঠ ও কট্টর মনও কোমল, বিগলিত ও অনুগত হয়ে যায় এবং আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। অথচ সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার সুযোগ

ছিলো, তখন তারা করেছে তাঁর নাফরমানী। আর এখন জীবনের যবনিকার মুহূর্তে অক্ষম, বাধ্য ও ঠেকা অবস্থায় যখন কিছুই করার সুযোগ নেই তখন এরা আল্লাহর আনুগত্যের ঘোষণা দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের এ মুহূর্তের তাওবা, ঈমান ও আনুগত্যের ঘোষণা কবুল করেন না। তাদের মৃত্যুকালীন কঠিন অবস্থা ও আনুগত্যের ঘোষণা পৃথিবীর মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না এবং তা শুনতে পায়না। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করে পৃথিবীর মানুষকে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. (المؤمن : ٨٤-٨٥)

"তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন বললো, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে অস্বীকার করলাম। কিন্তু আমার শাস্তি দেখার পর তাদের ঈমান তাদের জন্য কোনো উপকারে আসলো না।" (আল মুমিন : ৮৪, ৮৫)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ، حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا. (النساء : ١٨)

"আর এমন লোকদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মাথার ওপর মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলতে থাকে : আমি এখন তাওবা করছি। আর তাওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফুরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।" (আন-নিসা : ১৮)

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْ إِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُه بَغْيًا وَّعَدْوًا، حَتّٰى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الَّذِىْ

اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ. (يونس : ٩٠-٩١)

"আমি বনু ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনী যুলুম ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে পেছনে চললো। শেষ পর্যন্ত ফিরআউন যখন ডুবতে লাগলো তখন বলে ওঠলো, "বনু ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে আমিও তারই ওপর ঈমান আনলাম, যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে শামিল হলাম।" (জওয়াব দেয়া হলো) এখন ঈমান এনেছে! অথচ এর আগ পর্যন্ত তুমি নাফরমানীই করেছিলে এবং ফাসাদকারীদের মধ্যে ছিলে।" (ইউনুস : ৯০, ৯১)

মনের জমির চাষ

ফসলের জমির সাথে মনকে তুলনা করা হয়েছে। কিছু জমিন আছে যাতে আগাছা-পরগাছা, বিভিন্ন ধরনের কাঁটাদার ও বিষবৃক্ষ জন্মে আছে। তেমনি এমন অনেক মন আছে যাতে আগাছা-পরগাছা, কাঁটাদার ও বিষবৃক্ষতুল্য ইসলাম বিরোধী চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, অভ্যাস ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে। কিছু জমিন আছে যা এমন অনুর্বর ও শক্ত যে, তার ভেতর পানি প্রবেশ করেনা, তা পানি ধারণ করে রাখেনা এবং তা নরম হয়না। তাতে কোনো বীজ ফেলা হলে তা থেকে চারা অঙ্কুরিত হয়না। তেমনি এমন অনেক মন আছে যা এমন পাষাণ, কঠিন ও ভ্রষ্ট যে, তাতে কোনো ওয়াজ-নসীহত ও উত্তম কথা প্রবিষ্ট হয়না এবং তাতে কোনো উত্তম ও কল্যাণমূলক চিন্তা ও কল্পনা উদয় হয়না।

পক্ষান্তরে এমন কিছু জমিন আছে, যা উর্বরা ও নরম। তা সহজেই পানি গ্রহণ করে ও পানি সংরক্ষণ করে রাখে। তাতে যে কোনো উত্তম বীজ ফেলা হলে তা থেকে সবুজ-শ্যামল হৃষ্ট-পুষ্ট চারা অঙ্কুরিত হয়। তেমনি এমন অনেক মন আছে যা স্বচ্ছ ও কোমল। তা যে কোনো মহৎ, উত্তম, সঙ্গত ও সঠিক কথা সহজেই গ্রহণ করে। তাতে শুধুমাত্র গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক চিন্তা ও কল্পনাই উদয় হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِّنْهَا أُخْرٰى إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَاتُنْبِتُ كَلَأً. فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)

"আমাকে আল্লাহ্ যে হেদায়াত ও ইল্‌ম সহকারে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ বৃষ্টির মতো। বৃষ্টির পানি কোনো জমিতে পড়লে জমির ভালো অংশ তা চুষে নেয় এবং বহু ঘাস জন্মায়। জমির আর এক অংশ যাতে বৃষ্টির পানি আটকে থাকে এবং আল্লাহ তার দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা সেখান থেকে পানি পান করে এবং তা দিয়ে জমিতে সেচ দেয় ও ফসল উৎপন্ন করে। জমির আর এক অংশ ঘাসহীন অনুর্বর এলাকা, যেখানে পানিও আটকায়না, ঘাসও হয়না। এটা হচ্ছে সেই লোকের উদাহরণ, যে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন তা তাকে উপকৃত করে। সে নিজেও জ্ঞান লাভ করে এবং অপরকেও জ্ঞান দান করে। আর শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে দ্বীনের জ্ঞানের দিকে ফিরেও তাকায়না এবং আল্লাহর যে বিধান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা সে গ্রহণও করে না।" (বুখারী ও মুসলিম। আবু মূসা রা.)

এ হাদীসে বিভিন্ন ধরনের জমির উদাহরণ দ্বারা বিভিন্ন মনের অধিকারী মানুষের কথা বুঝানো হয়েছে। মানুষের মাঝে এ হাদীসের বাস্তব চিত্র আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করে থাকি। কেউ কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য শুনে প্রভাবিত হয় এবং তা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করে। আবার কেউবা তা শুনেও প্রভাবিত হয় না এবং তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না।

কোনো জমিন থেকে কোনো ফসল পেতে হলে যে কাজগুলো করতে হয় তা হলো :

* জমি থেকে আগাছা-পরগাছা পরিষ্কার করা,

* জমি উপড়ানো,

* প্রয়োজনে পানি সেচ দেয়া,

* মই দিয়ে মাটি সমান করা,

* বীজ ফেলা,

* পশু-পক্ষীর আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করা,

* কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা,

* কিছুদিন পর পর নিড়িয়ে ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করে দেয়া,

* বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধির উপদ্রব থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা,

* ফসল কেটে ঘরে তোলা পর্যন্ত সার্বক্ষণিকভাবে তা পাহারা দেয়া,

এমনিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াত থেকে দূরে অবস্থানকারী একজন মানুষকে হেদায়াতের পথে আনতে হলে যে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে তা হলো :

* মনের মাঝে পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত ভুল ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতি অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্ন সহকারে দূর করতে হবে। জমির আবর্জনা পরিষ্কার করা সহজ। কিন্তু মনের আবর্জনা পরিষ্কার করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। মনে রাখতে হবে যে, চাপ প্রয়োগে ও বাধ্য করে মন থেকে কোনো বিশ্বাস ও চেতনা দূর করে তথায় অন্য কোনো বিশ্বাস ও চেতনা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। তা একমাত্র তুষ্টি ও স্বতঃস্ফূর্ততার মাধ্যমেই সম্ভব। অতএব আহ্বানকারীকে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও ধৈর্যের অধিকারীও হতে হবে। ভুল ধারণা ও গোমরাহির বিভিন্ন অবস্থা ও ধরন হতে পারে। যার মনে যে ধরনের দুর্বলতা ও ভুল ধারণা বিদ্যমান আহ্বানকারীকে সুনির্দিষ্টভাবে তা নিরসন করে তথায় সঠিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে।

এ স্থলে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঈমানের একটি মৌলিক শর্ত হলো, "আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন বিধানকে পরিপূর্ণভাবে পরিপূর্ণ তুষ্টি ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে মেনে নেয়া।" ইসলামের ন্যূনতম কোনো একটি বিষয়ের প্রতি মনে সামান্যতম অবিশ্বাস, অনীহা ও বিদ্বেষ থাকলে ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ ঈমান সহকারে নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাতসহ যে কোনো ইবাদত ও কল্যাণমূলক কাজই করা হোক না কেন তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না।

ইসলামী জীবন বিধানের যে কোনো একটি বিষয়ের প্রতি সামান্যতম আপত্তি ও বিরোধিতা থাকার মানে হলো এ কথার ঘোষণা দেয়া যে, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) ভুল করেছেন। এ বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা তাঁদের উচিত হয়নি।" নাঊযুবিল্লাহ!

অতএব তার ঈমানের ঘোষণা ও ইবাদত কিভাবে কবুল হতে পারে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর পরিচয় জানার জন্য আমার লেখা 'মুরাকাবাহ্'র হাকীকত' বইটি পড়ুন। পূর্ণ ইসলামী জীবন বিধানকে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন, দ্বিধাহীন ও শর্তহীনভাবে মেনে নিতে হবে।

* কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মনকে সমৃদ্ধশালী করতে হবে। এতে ইসলামের অনুশীলন ও বাস্তবায়নের জন্য মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যাবে। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করে

মনকে আলোকিত করাকে হাদীস শরীফে জমিনের পানি চুষে নেয়া ও তা নিজের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

* ইসলামের অনুশীলন করার পাশাপাশি অন্যদেরকে এর দিকে দাওয়াত দিতে হবে। এতে তার মনে ইসলামের ব্যাপারে মযবুতি, আন্তরিকতা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। এ কার্যক্রমকে হাদীস শরীফে জমিতে পানি সেচ দেয়া ও তাতে ফসল উৎপন্ন করার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

* ইসলাম বিরোধী চিন্তা, চেতনা এবং শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে নিজের ঈমান ও আমলকে হেফাযত করতে হবে এবং যে কোনো ধরনের ধোঁকা, প্রতারণা ও চক্রান্তের ব্যাপারে সর্বদা মানসিকভাবে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। একে জমির ফসলকে যে কোনো ধরনের ক্ষতি ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করার সাথে তুলনা করা যায়।

এভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে মনের মাঝে ঈমানের যে পবিত্র মহাবৃক্ষ সৃষ্টি হয় তার মূল জমিনে, কিন্তু শাখা-প্রশাখা আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত। তা আল্লাহর হুকুমে সর্বদা ফল দিয়ে যায়, যা সে নিজে ও অন্যেরা ভোগ করে।

মনের ব্যাধি

দেহ যেমন রোগাক্রান্ত হয় তেমন মনও রোগাক্রান্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। যে কোনো ধরনের পাপই হলো মনের ব্যাধি।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِيْ قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ مِنْهَا صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ ، فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ "كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ". (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)

"বান্দা যখন একটি গুনাহ্ করে তখন তার মনে একটি কালো দাগ সৃষ্টি হয়। যদি সে তাওবা করে তাহলে তা তার মন থেকে মুছে যায়। আর যদি সে গুনাহ করতেই থাকে তাহলে তার মনে কালো দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কথারই সমার্থক হলো আল্লাহ তা'আলার কথা "কক্ষনো নয়, বরং আসলে ওদের মনে ওদেরই বদ কাজের (দরুন) মরিচা ধরে গেছে।" (ইবনু মাজাহ ও তিরমিযী; আবু হুরাইরা রা.)

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ، فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، فَإِنْ عَادَ فِيْهَا حَتّٰى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، فَهُوَ الرَّانُ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ : كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

"বান্দা যখন একটি গুনাহ্ করে তখন তার মনে একটি কালো দাগ সৃষ্টি হয়। যদি সে গুনাহ্ থেকে বিরত হয়ে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে অন্তর থেকে কালো দাগটি মুছে যায়। আর যদি সে গুনাহ্ করতেই থাকে তাহলে এক পর্যায়ে তার মন সম্পূর্ণরূপে কালিমায় ভরে যায়। এটাই হলো ঐ মরিচা, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : "কক্ষনো নয়, বরং আসলে ওদের মনে ওদেরই বদ কাজের (দরুন) মরিচা ধরে গেছে।" (নাসাঈ; আবু হুরাইরা রা.)

নেকী ও গুনাহের পরিমাণ হিসেবে মনের নূর ও অন্ধকারের বৃদ্ধি-ঘাটতি হয়। নেকীর পরিমাণ যত বৃদ্ধি হয় মনের নূরের পরিমাণ ততো বৃদ্ধি পায়। আর গুনাহের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় মনের নূর নির্বাপিত হয়ে তথায় গোমরাহির অন্ধকার ততো বেশি বৃদ্ধি পায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে অন্ধ মন বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ.
(الحج : ٤٦)

"আসলে চোখ অন্ধ হয় না, কিন্তু ঐ মন অন্ধ হয়ে যায় যা বুকে রয়েছে।" (আল-হাজ্জ : ৪৬)

কারোর মন যখন অন্ধ হয়ে যায় তখন তা হয়ে যায় আবরণযুক্ত ও কঠিন। কুরআন ও হাদীসের আলোচনা ও আহ্বান তাতে রেখাপাত করে না। এক পর্যায়ে তা সত্য দ্বীন ও হেদায়াতের বিরোধী ও তার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে যায়। তখন সকল পাপাচার তার কাছে প্রিয় হয়ে যায় আর সকল নেক ও পুণ্যের কাজ হয়ে যায় তার নিকট ঘৃণ্য ও অপছন্দনীয়। হিদায়াতের বাণী গ্রহণকারী মন এবং তা প্রত্যাখ্যানকারী মনের পার্থক্য বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ. (فاطر : ١٩)

"অন্ধ ও চোখওয়ালা সমান নয়।" (ফাতির : ১৯)

অর্থাৎ হেদায়াত গ্রহণকারীর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাকে আখেরাতে নাজাত দান করবেন। আর হিদায়াত প্রত্যাখ্যানকারীর প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট এবং তাকে আখেরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিতে নিমজ্জিত করবেন।

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْأَعْمٰى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ. هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ. (هود : ٢٤)

"এ দু'টো দলের উদাহরণ এ রকম– যেমন একজন হলো, যে চোখেও দেখে না, কানেও শুনেনা। আর অপরজন হলো, যে দেখে ও শুনে। এরা কি এক সমান হতে পারে? তোমরা কেন (এ উদাহরণ থেকে) কোনো শিক্ষা গ্রহণ করো না?" (হূদ : ২৪)

হেদায়াতের বাণী প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، بَلْ هُمْ أَضَلُّ. (الأعراف : ١٧٩)

"তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার চাইতেও অধম।" (আল আ'রাফ : ১৭৯)

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ. (المدثر : ٤٩-٥٠)

"তাদের কি হয়েছে যে, তারা হেদায়াতের বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? এরা যেন ভীত বন্য গাধা। বাঘের ভয়ে পালাচ্ছে।" (আল মুদ্দাস্‌সির : ৪৯, ৫০)

কুরআন মাজীদের মতো এতো উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হেদায়াতের বাণী প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হয়ে বলেন :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا. (محمد : ٢٤)

"তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?" (মুহাম্মাদ : ২৪)

মনের চিকিৎসা

ব্যাধিগ্রস্ত মনের চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হবে।

১. তাওবা ও ইস্তেগফার করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَتُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (النور : ٣١)

"হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।" (আন-নূর : ৩১)

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهُ، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّىْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ. إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (هود : ٣، ٤)

"আর তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর নিকট তাওবা করো। তাহলে এক বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে ভালো জীবিকা দান করবেন এবং তাঁর মেহেরবানী পাওয়ার যোগ্য প্রত্যেককে তিনি অনুগ্রহ দান করবেন। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের আযাবের ভয় করছি। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে আসতে হবে এবং তিনি সবকিছু করারই ক্ষমতা রাখেন।" (হূদ : ৩, ৪)

আল্লাহর নিকট খাঁটিভাবে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন : "গুনাহ থেকে তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির মতো যার কোনো গুনাহ নেই।"

২. নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. (يونس : ٥٧)

"হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটা ঐ জিনিস, যা মনের সব রোগ সারায় এবং মুমিনদের জন্য তা হেদায়াত ও রহমত।" (ইউনুস : ৫৭)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. (بنى إسرائيل : ٨٢)

"আমি কুরআনে এমন কিছু নাযিল করছি যা মুমিনদের জন্য চিকিৎসা ও রহমত।" (বানী ইসরাঈল : ৮২)

সরল ও সঠিক পথের সন্ধানপ্রার্থী প্রতিটি মানুষের জন্য কুরআন মাজীদ হচ্ছে পথপ্রদর্শক। কুরআন মাজীদ মনের সকল অমানিষা দূর করে তাতে ঐশী আলো জ্বালিয়ে দেয়। তা সকল প্রয়োজন ও সমস্যা দূর করে মনকে করে দেয় তৃপ্ত, প্রশান্ত ও তুষ্ট।

৩. নিয়মিত হাদীস অধ্যয়ন করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. (الحشر : ٧)

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা নিয়ে নাও এবং যা থেকে বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" (আল-হাশর : ৭)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যা। অতএব হাদীস ছাড়া কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে বুঝা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

৪. নিষ্ঠার সাথে আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহ পালন করা

মানুষের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা তাদের ওপর আরোপ করেছেন নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান। উক্ত আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে পালন করা ছাড়া মানুষের জীবন কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না।

৫. বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক তথা

জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধান। অতএব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া বিধানকে মেনে চলা ছাড়া মানুষ কিছুতেই সুখি ও সমৃদ্ধশালী হতে পারে না।

৬. কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা

আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি যে, যে কোনো গুনাহ্ই মানুষের মনে মরিচা ও কালো দাগ সৃষ্টি করে। অতএব কবীরা অর্থাৎ বড় গুনাহসমূহই মনকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি ও জরাগ্রস্ত করে। তাই তা থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। ছোট ও বড় গুনাহসমূহের পরিচয় জানার জন্য আমার লেখা 'তাওবা ও ইস্তেগফার' বইটি পড়ুন।

৭. সর্বদা আখিরাতের কথা ভাবা

আমাদের দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। বরং মৃত্যুর পর আখিরাতের অনন্তকালীন জীবনে আমাদেরকে প্রবেশ করতে হবে। তথায় আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও কাজের হিসাব দিতে হবে। উপরোক্ত অনুভূতি ও বিশ্বাস মানুষকে সকল বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করে আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র সরল ও সঠিক পথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত করে।

৮. আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতা ও মহানত্বের কথা ভাবা

সকল প্রকারের সংকীর্ণতা, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত। এ পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য যা প্রয়োজন আল্লাহ মানুষকে তাই দান করেছেন। এ ইহজাগতিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার মাপকাঠিতে পরিমাপ করে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝা ও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বরং তাঁর অসীমত্ব ও মহানত্বের ধারণা মনে প্রতিষ্ঠিত করেই তাঁকে চেনা ও উপলব্ধি করা সম্ভব। তাঁর অসীমত্ব ও বিশালত্বের চাক্ষুস প্রমাণ ও সাক্ষী সৃষ্টি জগতের হাজার হাজার নিদর্শনাবলীর দিকে মনোনিবেশ করলে যে কোনো মানুষের মনই তাঁর প্রতি নিবেদিত ও সমর্পিত হতে বাধ্য।

৯. প্রতিদিন অধিক সংখ্যকবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

পৃথিবীর কোনো মানুষই মৃত্যুকে অবিশ্বাস করে না, মৃত্যুর প্রত্যাশা করে না এবং মৃত্যুর জন্য উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করে না। মানুষ যত বড় পাপিষ্ঠই হোক না কেন মৃত্যুর স্মরণ ও মৃত্যুর দৃশ্য তার মনে অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

"أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ". (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ)

"তোমরা (দুনিয়ার) স্বাদ-আহলাদ নিঃশেষকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি করে স্মরণ করো।" (তিরমিযী; আবু হুরাইরা রা.)

১০. সময় পেলেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শেখানো পদ্ধতিতে কবর যিয়ারত করা

আপন-পর, চেনা-অচেনা যে কোনো মৃত ব্যক্তির কবর যিয়ারত যিয়ারতকারীর মনকে প্রভাবিত করে। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) মুমিনদেরকে কবর যিয়ারত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا." (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"আমি ইতোপূর্বে তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। (এখন) তোমরা কবর যিয়ারত করো।" (মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

"فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُوْرَ الْقُبُوْرَ فَلْيَزُرْ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُنَا الْآخِرَةَ."

"অতএব কেউ কবর যিয়ারত করতে চাইলে সে যেন তা করে। কারণ কবর যিয়ারত আমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"*

১১. মন থেকে অহঙ্কার দূর করে তথায় নম্রতা ও বিনয়তা প্রতিষ্ঠা করা

অহঙ্কার কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা আলাদাভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, অহঙ্কার সরাসরি এবং অতি দ্রুত মানুষের মন ও জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করে। সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের জন্য অহঙ্কারী মনের দুয়ার রুদ্ধ হয়ে যায়। আর অসত্য, অন্যায় ও পাপের জন্য তা হয়ে যায় উন্মুক্ত ও অবারিত। অহঙ্কারীকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

---

* কবর যিয়ারতের নিয়ম ও দু'আ জানার জন্য আমার লেখা 'ইসলামে আধুনিকতা' বইটি পড়ুন।

"যার মনে অণু পরিমাণ অহঙ্কার রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (মুসলিম; আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ : اَلْعِزُّ إِزَارِىْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ، فَمَنْ يُنَازِعُنِىْ فِىْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَدْ عَذَّبْتُهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : সম্মানিত মহান আল্লাহ বলেন : ইয্যত ও মাহাত্ম্য হচ্ছে আমার পাজামা এবং অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর। যে ব্যক্তি এ দু'টির কোনো একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষ ও বিবাদে লিপ্ত হবে তাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেবো।" (মুসলিম)

পক্ষান্তরে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনকারীর প্রতি বর্ষিত হয় আল্লাহর অবারিত রহমত ও বরকত।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)

"কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মুসলিম; আবু হুরায়রা রা.)

১২. সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিখানো দু'আ ও যিক্র করতে থাকা

দু'আ ও যিক্র হচ্ছে ইবাদতের প্রাণ বা আত্মার সমতুল্য। দু'আ ও যিকরের মাধ্যমে বান্দা তার মনকে তৃপ্ত প্রশান্ত ও উন্নত করে। সর্বোপরি দু'আ ও যিক্র হচ্ছে বান্দা ও তার রবের মাঝে সম্পর্ক ও যোগাযোগের একটি সেতুবন্ধন। অতএব এ থেকে বিমুখ হয়ে জীবন যাপন করা কোনো মুমিনের পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও মুহূর্তে যেসব দু'আ ও যিক্র করেছেন তাই আমাদের জন্য অনুকরণীয়। অতএব যে কোনো মুমিনই কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দু'আ ও যিক্রসমূহের আমল করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও উন্নতি দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধশালী করতে পারে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা ও কর্মসূচীসমূহের যথাযথ প্রয়োগ মনের সকল ব্যাধি ও গোমরাহির অন্ধকারকে দূরীভূত করে তাকে করে দেয় আল্লাহর প্রতি নিবেদিত ও অনুগত। তাতে সৃষ্টি হয় দৃঢ় প্রত্যয়, মযবুতি ও স্থিতিশীলতা। আর অনন্ত অসীম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর গভীর ভালোবাসায় প্রাণ ও জীবন হয়ে যায় তৃপ্ত ও সিক্ত। এ নশ্বর পৃথিবীতে এর চাইতে উপভোগ্য আর কিছু নেই ও হতে পারে না।

মনের কাঠিন্যতা ও কোমলতা

আমরা ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি যে, গুনাহ মনকে কালিমাযুক্ত করে দেয়। গুনাহের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় মনের কালিমা ততো বৃদ্ধি পায়। আর যে মন যত বেশি কালিমাচ্ছন্ন হয় সে মন ততো বেশি কঠিন হয়। মনের কাঠিন্যতা একটি মারাত্মক ব্যাধি। মৌলিক মানবীয় গুণাবলী হ্রাস পাওয়ার কারণেই মন কঠিন হয়। অতএব কঠিন মনের অধিকারী ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে পশুর স্তরে নেমে আসে। এ ভয়ানক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হলো উপরোক্ত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়ন করা। উক্ত কর্মসূচীসমূহ যথাযথভাবে পালন করলে মনে কিছুতেই কাঠিন্যতা সৃষ্টি হতে পারে না। বরং তাতে মৌলিক মানবীয় গুণসমূহ বিকশিত ও প্রস্ফুটিত হয়। আর তাতে সৃষ্টি হয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর অনুরাগ, আবেগ, ভালোবাসা ও নিষ্ঠা। এ ধরনের মনের অধিকারী ব্যক্তি যখন কুরআন ক্বারীদের তিলাওয়াত শুনে, নিজে কুরআন তিলাওয়াত করে, ওয়ায-নসীহত শুনে এবং আল্লাহর বিস্ময়কর কুদরত ও ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর দিকে তাকায় তখন সে গভীরভাবে প্রভাবিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আল্লাহর ভালোবাসায় ক্রন্দন করে। আল্লাহর ভালোবাসায় ক্রন্দন করার মাঝে যে কি তৃপ্তি ও মজা তা ব্যক্ত করে বুঝাবার বিষয় নয়। বরং মনকে আবাদ করে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমেই একমাত্র তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

এ ধরনের মনের অধিকারী ব্যক্তির চিন্তা, চেতনা ও অনুভূতি এ নশ্বর ও পতনশীল জগতের মাঝে আবদ্ধ থাকে না। বরং তা অনন্ত-অসীম স্রষ্টা ও আখেরাতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। আর তা তার সকল কর্মতৎপরতার মাঝে প্রতিবিম্বিত হয়।

ধারাবাহিকভাবে পাপ কাজ করতে করতে যাদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছে, তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ أُولٰئِكَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

(الزمر : ٢٢)

"যাদের মন আল্লাহর যিক্‌রেও (কুরআনের তিলাওয়াত ও আলোচনা শুনেও) বিগলিত ও প্রভাবিত হয় না তাদের জন্য ধ্বংস। এরা স্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত। (আয-যুমার : ২২)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ. (الحديد : ١٦)

"যারা মুমিন তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে মন বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি ? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের মন কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" (আল-হাদীদ : ১৬)

পক্ষান্তরে কোমল মনের অধিকারী বান্দাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ. (الزمر :٢٣)

"আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন। তা এমন এক কিতাব, যার সব অংশ একই রং-এর, যার মধ্যে বার বার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ কিতাব শুনে ঐসব লোকের লোম খাড়া হয়ে যায়, যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর তাদের দেহ ও মন নরম হয়ে আল্লাহর যিক্‌রের দিকে উৎসাহী হয়ে ওঠে।" (আয-যুমার : ২৩)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُه زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. (الأنفال : ٢)

"প্রকৃত মুমিন তো তারা, যাদের মন আল্লাহর কথা শুনলে কেঁপে ওঠে। যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে।" (আল-আনফাল : ২)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ. (الملك : ١٢)

"যারা তাদের রবকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।" (আল-মুলক : ১২)

وَيَخِرُّوْنَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا. (بنى إسرائيل : ١٠٩)

"আর তারা মুখ নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং (কুরআন শুনে) তাদের বিনয় আরো বেড়ে যায়।" (বনী ইসরাঈল : ১০৯)

যারা আল্লাহর ভয় ও মহব্বতে ক্রন্দন করে আল্লাহ তাদের ওপর খুবই খুশি হন এবং তাদের ওপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেন।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ." (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে সে দোযখে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত দুধ স্তনে ফিরে না আসে। (অর্থাৎ দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব তেমন তার দোযখে প্রবেশ করাটাও অসম্ভব) আর আল্লাহর পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্র হবে না।" (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে ধুলি মলিন হয়েছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না)। (তিরমিযী)

عَنْ أَبِىْ أُمَامَةَ صُدَىٍّ بْنِ عَجْلاَنَ الْبَاهِلِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ. قَطْرَةِ دُمُوْعٍ مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقَطْرَةِ دَمٍ تُهْرَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. وَأَمَّا الْأَثْرَانِ فَأَثَرٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالَى وَأَثَرٌ فِىْ فَرِيْضَةٍ مِّنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ تَعَالَى. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আলবাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন : "আল্লাহর নিকট দু'টি বিন্দু এবং দু'টি চিহ্নের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছু নেই। দুইটি বিন্দুর একটি হলো আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রু এবং অপরটি হলো আল্লাহর পথে (জিহাদে) প্রবাহিত রক্ত। আর দুইটি চিহ্নের একটি হলো আল্লাহর

পথে (জিহাদে আহত হওয়ার) চিহ্ন এবং দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহর ফরযসমূহের মধ্যে কোনো ফরয আদায় করার চিহ্ন।" (তিরমিযী)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ النَّارِ. (الزمر : ٨)

"মানুষের ওপর যখন কোনো বিপদ আসে তখন সে তার রবের দিকে রুজু হয়ে তাকে ডাকে। তারপর যখন তার রব তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে ঐ মুসীবতকে ভুলে যায়, যার কারণে সে আগে তাকে স্মরণ করেছিল। আর সে অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানায়, যাতে তারা তাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দেয়। (হে নবী!) তাকে বলুন, তোমার কুফরী দ্বারা অল্প কিছুদিন মজা করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি দোযখবাসীদের একজন।" (আয-যুমার : ৮)

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ. لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. (الروم : ٣٣-٣٤)

"লোকদের অবস্থা এই যে, যখন তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন তাদের রবের দিকে একমুখী হয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে। তারপর যখন তিনি তাঁর দয়ার কিছু স্বাদ ভোগ করান, তখন হঠাৎ তাদের মধ্যে কতক লোক তাদের রবের সাথে (অন্য কিছুকে) শরীক বানিয়ে নেয়, যাতে আমি তাদেরকে যা দান করেছি এর না শোকরী করে। বেশ, মজা করে নাও। শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে।" (আর-রূম : ৩৩-৩৪)

وَإِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَأَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ. (يونس : ١٢)

"মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তার ওপর কোনো কঠিন সময় আসে তখন সে

বসা, দাঁড়ানো বা শোয়া অবস্থায় আমাকে (সব সময়) ডাকে। কিন্তু আমি যখনি তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলে, যেন সে কখনো তার কোনো বিপদের সময় আমাকে ডাকেইনি।" (ইউনুস : ১২)

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، حَتّٰى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ. فَلَمَّا أَنْجٰهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. (يونس : ٢٢-٢٣)

"তিনিই ঐ সত্তা, যিনি জলে স্থলে তোমাদেরকে ভ্রমণ করান। সুতরাং যখন তোমরা নৌযানে চড়ে অনুকূল বাতাসে খুশি মনে সফর করতে থাকো, তখন হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলে চারদিক থেকে ঢেউ-এর ঝাপটা আসে এবং আরোহীরা ধারণা করে যে, তারা ঘেরাও হয়ে গেছে। ঐ সময় সবাই তাদের আনুগত্য আল্লাহর জন্য খাস করে দিয়ে দু'আ করে, "যদি আমাদেরকে এ মহাবিপদ থেকে নাজাত দাও তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।" কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন তখন এরাই সত্য থেকে বিমুখ হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। দুনিয়ার কয়দিনের মজা ভোগ করে নাও। এরপর আমারি কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো যে, তোমরা কি করে এসেছো।" (ইউনুস : ২২-২৩)

মানুষের স্বভাব হলো, সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হলে অহঙ্কার ও সীমালঙ্ঘন করে। আর দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত হলে তার মন কোমল হয় এবং সহজেই হেদায়াত ও নসীহত কবুল করে। নিম্নে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের বিভিন্ন অবস্থা ও তার আলোকে তার মনের অবস্থা ও গতি বিশ্লেষণ করা হলো।

১। মানুষ যখন দৈহিক দিক থেকে সুস্থ, আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল ও

সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে সাধারণত অহঙ্কারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও কঠিন মনের অধিকারী হয়ে থাকে।

২. যখন আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল, কিন্তু দৈহিক দিক থেকে অসুস্থ হয়, তখন সে অহঙ্কারী ও গুনাহগার হলেও তার মন কিছুটা দুর্বল ও কোমল থাকে।

৩। যখন আর্থিক ও দৈহিক উভয় দিক থেকেই দুর্বল হয়, তখন তার মন পূর্বাপেক্ষা আরো দুর্বল ও কোমল হয় এবং সহজেই হেদায়াত ও নসীহত কবুল করে।

৪। যখন আর্থিক দিক থেকে দুর্বল এবং দৈহিক দিক থেকে সে কোনো মারাত্মক ও বড় রোগে আক্রান্ত হয়, যেমন– তার হার্টের অপারেশন হয়েছে, বা কিডনী সংযোজন করা হয়েছে, একটি বা দুইটি চক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে, বা একটি পা বিকল হয়ে গেছে, বা একটি হাত বিকল হয়ে গেছে, বা দেহের এক পাশ পক্ষাগাতগ্রস্ত (Paralysed) হয়ে গেছে অথবা অন্য যে কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীর জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য চিরতরে শেষ হয়ে গেছে, তখন তার মন পূর্বাপেক্ষা আরো বেশি দুর্বল ও কোমল হয়ে যায় এবং মনে মনে বলে অথবা মুখে বলে যে, আল্লাহ যদি আমাকে পূর্ণ সুস্থ করে দিতেন তাহলে আমি তৃপ্তি ফুরিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতাম।

৫। অথবা দৈহিক দিক থেকে সে এমন রোগে আক্রান্ত হয়েছে যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার ঘোষণা করেছে যে, সে কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করবে, অথবা যে কোনো অন্যায়ের কারণে বন্দী অবস্থায় কোর্ট থেকে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আগামী এতো দিনের মধ্যে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে, তাহলে এমতাবস্থায় তার মন পূর্বাপেক্ষা আরো অনেক বেশি দুর্বল ও কোমল হয়। সে আল্লাহর দ্বীন ও আনুগত্যের বিরুদ্ধে যতই কট্টর ও অহঙ্কারী হোক না কেন এমতাবস্থায় তা মন থেকে দূরীভূত হয়ে গিয়ে এ ব্যাপারে তার মন নমনীয় ও অনুগত হয়ে যায়।

৬। হে আল্লাহর বান্দা! মনে করুন আপনার মৃত্যু হয়ে গেছে। আপনার স্ত্রী, সন্তানাদি ও অন্যান্য আপনজনরা আপনার লাশকে ঘিরে মাতম ও আর্তনাদ করছে। এমন সময় আপনার ৬/৭ বছরের একটি সন্তান স্কুল থেকে ঘরে ফিরে এসে দেখে, মাটিতে পড়ে থাকা তার পিতার দেহটিকে একটি কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে, আর তাকে ঘিরে সবাই কান্নাকাটি করছে। এ দৃশ্য দেখে সে বলে, আমার আব্বার কি হয়েছে ? তোমরা তাকে ঢেকে রেখেছো কেন? তোমরা

কাঁদছো কেন ? এ শিশু ইতোপূর্বে জীবনে আর কোনদিন মৃত লাশ দেখেনি। যখন সে বুঝতে পেরেছে যে, তার আব্বা মরে গেছে তখন সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে পিতার লাশকে জড়িয়ে ধরার জন্য লাশের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু সবাই তাকে সামনে অগ্রসর হতে না দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। এতে তার শোক ও কান্না আরো বৃদ্ধি পায়। এতটি বছর যে পিতার কোলে, কাঁধে ও পিঠে উঠেছে, তাকে জড়িয়ে ধরেছে, তার সাথে খেলাধুলা করেছে এবং তার আদরে বুককে তৃপ্ত ও সিক্ত করেছে, আজ সবাই তাকে সে পিতাকে স্পর্শ করতে ও তার (লাশের) কাছে যেতে কেন বাধা দিচ্ছে সে তার কারণ কিছুই বুঝতে পারছে না।

আপনার দুই বছরের আরেকটি সন্তান আছে। সেও কাপড় দ্বারা আবৃত আপনার লাশকে দেখেছে। তাকে এ বলে মা প্রবোধ দিয়ে রেখেছে যে, তোমার আব্বু ঘুমিয়েছেন, তাকে জাগাইওনা। সে তখন থেকেই এ আশায় রয়েছে যে, আব্বু ঘুম থেকে ওঠে আমাকে কোলে নিয়ে আদর করবেন, আমাকে গোসল করাবেন এবং খাবারের সময় পাশে বসিয়ে আদর করে খাইয়ে দিবেন। কিন্তু কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন সে তার আব্বুকে দেখতে পায় না তখন আম্মুকে বার বার প্রশ্ন করতে থাকে, আম্মু! আব্বু কোথায় ? তিনি কোথায় ঘুমাচ্ছেন ? তিনি কখন ঘুম থেকে ওঠবেন? তিনি কখন আসবেন ? মা তার সন্তানের কচি মনের এ সরল প্রশ্নসমূহের কোনো জবাব দিতে পারে না বরং শুধুমাত্র নীরবে চোখ মুছতে থাকে। ফুলের মতো নিষ্কলঙ্ক শিশুর প্রশ্নসমূহ মায়ের মনে দীর্ঘ ২৫/৩০ বছর ধরে স্বামীর সাথে জীবন যাপনকালীন সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার শত শত স্মৃতিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলে আর অব্যক্ত শোক ও বেদনার অথৈ সাগরে সে হাবুডুবু খেতে থাকে।

আপনার ৮/৯ মাসের আরেকটি অনেক আদরের সন্তান আছে, যার চেহারায় সারাক্ষণ হাসির ঝলক লেগেই থাকে। তার চোখে চোখ পড়া মাত্রই মিষ্টি হাসিতে সে আপনার হৃদয়কে জুড়িয়ে দেয়। সে সারাক্ষণ বা বা বা বা বলতে থাকে। আপনার মৃত্যুর পর তার মুখের মিষ্টি হাসি ও বা বা বা শব্দ অব্যাহত আছে। কিন্তু বাবা যে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছেন এ অবোধ শিশুর এ কথা বুঝার ক্ষমতা নেই!

হে আল্লাহর বান্দা! আমি কোনো কল্প জগতের ছবি আঁকিনি, বরং এ বাস্তব জগতেরই কিছু চিত্র তুলে ধরেছি, যা এ পৃথিবীর সংসারে আপনার আশে-পাশে সচরাচর ঘটে থাকে। উপরোক্ত দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ অথবা কল্পনা করার পর ন্যূনতম

অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের মনও প্রভাবিত হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি তার মন নিবেদিত হয় এবং মনের কাঠিন্যতা বিদূরিত হয়ে তা কোমল ও বিগলিত হয়।

উপরে কুরআন মাজীদের আয়াতের আলোকে মানুষের মনের বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আর এটাই মানুষের মনের স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতি। তবে প্রতিটি বিষয়েই স্বাভাবিক নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রমও ঘটে থাকে। যেমন :

দৈহিক দিক থেকে সুস্থ, আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ বিনয়ী, সভ্য, দয়ালু ও আল্লাহর প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়। পক্ষান্তরে–

দৈহিক দিক থেকে অসুস্থ, আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ অহঙ্কারী, কঠোর, দুশ্চরিত্রবান ও আল্লাহর নাফরমান হয়।

মানব মনের আরেকটি স্বভাব ও প্রকৃতি হলো, দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি তার মন বেশি আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়। পক্ষান্তরে অদৃশ্য, শ্রুত ও অনুভূতিগ্রাহ্য কোনো বিষয়ের প্রতি তার মন তেমন আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয় না। মানুষের বাস্তব জীবন থেকে গৃহীত উপরোক্ত চিত্র ও ঘটনাবলীর চাইতে আরো অনেক অনেক বেশি ভয়ানক ও বিভীষিকাময় চিত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কুরআন ও হাদীসে তুলে ধরেছেন। তা হলো, পাপী ও আল্লাহর অবাধ্য ব্যক্তির ওপর মৃত্যুর সময় আযরাঈল (আ) কর্তৃক জান কবযের কষ্ট, কবরে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি, কিয়ামতের ভয়াবহতা, হাশরের ময়দানের কষ্ট ও কাঠিন্যতা, জাহান্নামের উপরের পুলসিরাত অতিক্রম করার পরীক্ষা ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। মৃত্যু থেকে শুরু করে জাহান্নাম পর্যন্ত প্রতিটি স্তর গুনাহগারদের জন্য দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের চাইতে যে কতো বেশি ভয়ানক ও কষ্টকর হবে তা পরিমাপ বা তুলনা করার মতো ক্ষমতা মানুষের নেই।[১] কিন্তু দুনিয়ার মানুষ যেহেতু উক্ত দৃশ্যসমূহ চর্মের চক্ষু দ্বারা কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি সেহেতু তাদের অধিকাংশই তা শুনা সত্ত্বেও তেমন প্রভাবিত ও ভীত হয় না। বরঞ্চ তারা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট দ্বারাই তার চাইতে বেশি প্রভাবিত হয় এবং এর প্রতিই অধিক গুরুত্বারোপ ও মনোনিবেশ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ

টীকা-১ ঃ উক্ত স্তরসমূহের চিত্র হৃদয়ের চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করার জন্য আমার লেখা 'মুরাকাবার হাকীকত' বইটি পড়ুন।

فِى النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ، هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ، هَلْ مَرَّبِكَ شِدَّةً قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ : لاَ وَاللّٰهِ مَا مَرَّ بِى بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَرَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ)

"কিয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্য থেকে দুনিয়াতে সর্বাধিক প্রাচুর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হাযির করা হবে এবং তাকে দোযখে ফেলে সাথে সাথে বের করে আনা হবে, অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছো, তুমি কি কখনো প্রাচুর্যে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর শপথ! হে আমার রব! আবার বেহেশতীদের মধ্য থেকেও একজনকে হাযির করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ত ছিলো। অতঃপর তাকে খুব দ্রুত বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে সাথে সাথে বের করে আনা হবে, অতঃপর জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি কখনো কোনো অভাব দেখেছো, তুমি কি কখনো দুর্দশা ও অনটনের মধ্যে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, না, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো অভাব-অনটন দেখিনি এবং আমার ওপর দিয়ে কখনো কোনো দুর্দশাও অতিবাহিত হয়নি।" (মুসলিম; আনাস রা.)

দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-দুখের মাঝের ব্যবধান ও পার্থক্য উপলব্ধি করার জন্য উক্ত হাদীসটিই যথেষ্ট। দুনিয়ার জীবনের সবচেয়ে সুখী ব্যক্তিটি আখিরাতে দ্রুত দোযখে প্রবেশ করে মুহূর্তের মধ্যেই বেরিয়ে আসার পরই দুনিয়ার জীবনের সমস্ত সুখের কথা ভুলে যাবে। এমনিভাবে দুনিয়ার জীবনের সবচেয়ে দুখী ব্যক্তিটি আখেরাতে দ্রুত বেহেশতে প্রবেশ করে মুহূর্তের মধ্যেই বেরিয়ে আসার পরই দুনিয়ার জীবনের সমস্ত দুখের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে।

সকল কালেই আল্লাহর এমন অনেক বান্দা রয়েছেন যাঁরা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আখেরাতের সুখ-দুখের চিত্র তাঁদের মনের মাঝে মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে তাঁরা দুনিয়ার সুখ-দুখের চাইতে আখেরাতের সুখ-দুখের কথা

শুনে ও ভেবে শত শত গুণ বেশি প্রভাবিত হন। তাঁদের মন কোমল ও বিগলিত হয়ে তাঁরা মহান রবের নিকট সর্বদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রন্দন করেন। হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি আল্লাহর ঐ প্রিয় বান্দাদের মধ্যে শামিল হতে চান ? তাহলে আসুন! তাঁদের মতো কুরআন ও হাদীসের ইল্ম, আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের প্রতি ভালোবাসা, আখেরাতের প্রতি মযবুত ঈমান ও নেক আমল দ্বারা আপনার মনকে আবাদ করুন।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

গ্রন্থপঞ্জী

১। লিসানুল আরাব– ইবনু মানযুর

২। Englisn-Bengali Dictionary (Bangla Academy)

৩। শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়াহ্– ইবনু আবিল ইয্

৪। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম– ইমাম ইবনু কাসীর।

৫। আল কুরআনের সহজ বাংলা অনুবাদ– অধ্যাপক গোলাম আযম।

৬। সাফওয়াতুত তাফসীর– মুহাম্মাদ আলী সাবূনী।

৭। পবিত্র কুরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর– মাওলানা মুহিউদ্দিন খান। মূল : তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন– মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী' (রহ)

৮। রিয়াদুস সালিহীন– ইমাম নাবাবী (রাহ্)